

মুক্তিযুদ্ধে

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা

পর্ব-২

সংকলক

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু
(যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)
সিনিয়র সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ

তাকিয়া মোহাম্মদ পাবলিকেশন্স

১১,১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক

: মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)

বি.এস.এস. (অর্থনীতি); এম.এস.এস. (জাঃবিঃ)

☎ ০১৭ ১২৮৯৯৮৮৯, ০১৯১১০৩৩৩৬.

প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব © : মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

প্রচ্ছদ : মো. আসাদুজ্জামান (মামুন)

অলংকরণ : আয়শা নকিব

ISBN : 978-984-91094-7-1

মূল্য : ২০০ টাকা

উৎসর্গ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ও

৭৫ এ তাঁর পরিবারের সকল শহিদদের প্রতি



মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালির হাজার বছরের কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। অসীম সাহসীকতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট উৎরে যাওয়ার এক বড় ক্যানভাস। মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাসই রচিত হয়েছে তবে এর সূর্যসৈনিক যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের ইতিহাস সংরক্ষণ নেই। কিন্তু তারা বাঙ্গালি, জাতির বীর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। আর এই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধারই আছে আলাদা আলাদা অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা দিনপঞ্জি ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। কালের গহ্বরে অনেকেই আজ বিলীন হয়ে গেছেন, কিছু সংখ্যক এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের আমরা ক'জনইবা চিনি অথবা তাঁদের খোঁজ রাখতে পারি? এঁরাও একদিন আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হলে সেই সব অকুতোভয় কালজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসীকতা, বীরত্বগাঁথা আত্মত্যাগের ইতিহাস পৌঁছে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

“মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ” স্বউদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষদর্শীর যুদ্ধের বর্ণনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে ওয়েবসাইট www.mssangsad.com ও বই আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৩,২৭০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে “মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা” সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ভুয়াদের যুদ্ধের কোন বীরত্বগাঁথা নেই, আর এরা দেশের শত্রু ও দেশের জনগণের সম্পদ বিনষ্টকারী।

পরিশেষে সরকার ও স্বাধীনতার স্বপ্নের প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

মো. মাসুদুল করিম অরিয়ন

সভাপতি ও উদ্যোক্তা (মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশ)

মোবাইল: ০১৭১৫৪৪৮৪২৮

Facebook: মাসুদুল করিম অরিয়ন

Youtube: MISC BD

সূচি

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	শেখ মুজিবুর রহমান	৭-১৯
২	১৫ আগস্টের ঘটনা প্রবাহ	২০-২৫
৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু	২৬-৩৪
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা এফ.এম. আখতারুজ্জামান	৩৫-৪৩
৫	বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল	৪৪-৬১
৬	বীর মুক্তিযোদ্ধা সুশীল বিকাশ নাথ	৬২-৬৫
৭	বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া	৬৬-৮৯
৮	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোড়ল বজলুল করিম	৯০-৯২



শেখ মুজিবুর রহমান

পঞ্চাশ বছরের যাপিত জীবন ছিল বঙ্গবন্ধুর, যা সময়ের বিচারে বেশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু জীবনের দৈর্ঘ্যের চেয়ে তার কর্মের প্রস্থ ছিল অনেক বেশি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়- Larger than life অর্থাৎ জীবনের চেয়ে বড়। অল্প কথায় এ মহান নেতার জীবনী তুলে ধরা সম্ভব নয়, তবে সংক্ষিপ্তভাবে এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে বঙ্গবন্ধুর জীবনকাল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও মোসাম্মৎ সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে। খোকাকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়। ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে তিনি স্থানীয় মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে বেরিবারি রোগে আক্রান্ত হলে তার একটি চোখ কলকাতায় অপারেশন করা হয় এবং চোখেররোগের কারণে তার লেখাপড়ার সাময়িক বিরতি ঘটে। চক্ষুরোগে চার বছর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার পর শেখ মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। ১৮ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা আনুষ্ঠানিক বিয়ে সম্পন্ন হয়। তারা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এর জনক-জননী। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে এলে বঙ্গবন্ধু স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ত তা সারাবার জন্য ও ছাত্রাবাসের দাবি স্কুল ছাত্রদের পক্ষ থেকে তুলে ধরেন। শেখ মুজিব

নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। এস.এস.সি পাস করেন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গবন্ধু এই বছরেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলকাতাস্থ ফরিদপুর বাসীদের একটি সংস্থা ‘ফরিদপুরস্থ’ ডিসট্রিক্ট এসোসিয়েশন’-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে কলকাতায় দাঙ্গা প্রতিরোধ তৎপরতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আইন পরিষদে ‘পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে’ বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিক-ভাবে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান। খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব মুসলিম লীগের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কর্মতৎপরতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। ২ মার্চ ভাষা প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষা নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ১১ মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু সহকর্মীদের সাথে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভরত অবস্থায় গ্রেফতার হন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের সারাদেশে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে বঙ্গবন্ধুসহ গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু ১৫ মার্চ মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভের পর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্র-জনতার

সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় বঙ্গবন্ধু সভাপতিত্ব করেন। সভায় পুলিশ হামলা চালায়। পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ১৭ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান। ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান। কর্মচারীদের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে ২৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাকে জরিমানা করে। তিনি এ অন্যায় নির্দেশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে গ্রেপ্তার হন। ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তি লাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি লাভ করেন। ১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিমলীগ ভুখা মিছিল বের করে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেবার জন্য ১৪ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারে তাকে প্রায় দু বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়। ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু’। এর প্রতিবাদে বন্দি থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দি মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এ দাবিতে জেলখানায় অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিউর শহিদ হন। বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে এক বিবৃতিতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একটানা ১৭ দিন অনশন অব্যাহত রাখেন। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেওয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি “পিকিং”এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান

করেন। ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা হয়। এই লক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর দলের বিশেষ কাউন্সিল ডাকা হয় এবং এতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩ আসন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি আসন। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৫ মে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে বঙ্গবন্ধু করাচী থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন। ৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন, Sir, you will see that they want to place the word ‘East Pakistan’ instead of ‘East Bengal’. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word ‘Bengal’ has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite. অনুবাদ : “স্যার আপনি দেখবেন ওরা পূর্ববাংলা নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে; আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে

পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা। এক ইউনিটের প্রসঙ্গটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রসঙ্গটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলাভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রসঙ্গটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ববাংলার জনগণ অন্যান্য প্রসঙ্গগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রসঙ্গটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাবো তারা যেন আমাদের জনগণের ‘রেফারেন্ডাম’ অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন। ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট তিনি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি সফর করেন। ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়। ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারা ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ’ নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা

করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন। সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাকে সিলেটে, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বার বার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আট বার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত

হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিকসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়। ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সি এস পি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কার্য শুরু হয়। ৫ জানুয়ারি ৬ দফা সহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তিদান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, ‘গণ-অসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।’ পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন। ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী

উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’। তিনি বলেন, “একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র ‘বঙ্গোপসাগর’ ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে ‘বাংলা’ কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘বাংলাদেশ’।

৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রসঙ্গ আওয়ামীলীগ কে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে ‘নৌকা’ প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার খোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। ১২ নভেম্বরের গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকার ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আত্ম-মানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের উদাসীনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিনদিন বৈঠকের পর

আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।’ ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ২ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান। ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা’। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, “রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে।” শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নং সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন : This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh. Final victory is ours.

[অনুবাদ : ‘সম্ভবতঃ এটাই আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যাই তোমাদের হাতে আছে তার দ্বারাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ ব্যক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে, তোমাদের যুদ্ধ চলিয়ে যেতে হবে।’] -এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ট্রান্সমিটারে প্রেরিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা, ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রু দের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রু কে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।- শেখ মুজিবুর রহমান।

হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান বেতার যন্ত্র মারফত তাত্ক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। রাতেই এই বার্তা পেয়ে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করা হয় গভীর রাতে। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার অপরাধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১.১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং ২৬ মার্চ তাকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া

হয়। ২৬ শে মার্চ জেঃ ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠান হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লি-তে যাত্রা বিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছলে তাকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমান বন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করেন। ২৮

ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিঙ্ককোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ অক্টোবর বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরী’ পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্স এর প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্য-ফ্রন্ট গঠিত। ৬ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনের যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দান। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান

গমন করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু ২৫ ফেব্রুয়ারি এই জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুষের আহাৰ, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল- দুর্নীতি দমন; ক্ষেত্রে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন “বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ”। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে।

তথ্য সংগ্রহেঃ মাসুদুল করিম অরিয়ন।



১৫ আগষ্টের
ঘটনা প্রবাহ

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকের দিন। বাংলার আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতিও অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। কেননা পাঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মহেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে।

পাঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সুবেহ সাদিকের সময় যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভবনে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঘাতকরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল, তখন যে বৃষ্টি ঝরছিল, তা যেন ছিল প্রকৃতিরই অশ্রুপাত। ভেজা বাতাস কেঁদেছে সমগ্র বাংলায়। ঘাতকদের উদ্যত অস্ত্রের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শোকে আর অভাবিত ঘটনার আকস্মিকতায়। কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন।

সেই কালো রাতে শহিদ হয়েছিলেন যারা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের কালরাতে ঘাতকের হাতে নিহত হন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, জামালের স্ত্রী রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, এসবি অফিসার সিদ্দিকুর রহমান, কর্ণেল জামিল, সেনা সদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হক, প্রায় একই সময়ে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির বাসায় হামলা চালিয়ে শেখ ফজলুল হক মণি, তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা করে সেরনিয়াবাত ও তার কন্যা বেবী, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব

সেরনিয়াবাত এবং এক আত্মীয় বেনু খান। জাতি আজ গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে সকল শহিদকে।

সেই কালো রাতে যা ঘটেছিল

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী (রেসিডেন্ট পিএ) জনাব আ ফ ম মোহিতুল ইসলাম এর এজাহারে বর্ণনানুসারেঃ

১৯৭৫ সালে তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে কর্মরত ছিলেন। ১৪ আগস্ট (১৯৭৫) রাত আটটা থেকে ১৫ আগস্ট সকাল আটটা পর্যন্ত তিনি ডিউটিতে ছিলেন ওই বাড়িতে। ১৪ আগস্ট রাত বারোটার পর ১৫ আগস্ট রাত একটায় তিনি তাঁর নির্ধারিত বিছানায় শুতে যান। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা খেয়াল নেই। হঠাৎ টেলিফোন মিস্ত্রি আমাকে উঠিয়ে (জাগিয়ে তুলে) বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে ডাকছেন। তখন সময় ভোর সাড়ে চারটা কী পাঁচটা। চারদিকে আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু ফোনে আমাকে বললেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দৃষ্ণতকারী আক্রমণ করেছে। আমি জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করলাম। অনেক চেষ্টার পরও পুলিশ কন্ট্রোল রুমে লাইন পাচ্ছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করলাম। এরপর বঙ্গবন্ধু ওপর থেকে নিচে নেমে এসে আমার কাছে জানতে চান পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে কেন কেউ ফোন ধরছে না। এসময় আমি ফোন ধরে হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু আমার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে বললেন আমি প্রেসিডেন্ট বলছি। এসময় দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে একঝাঁক গুলি এসে ওই কক্ষের দেয়ালে লাগল। তখন অন্য ফোনে চিফ সিকিউরিটি মহিউদ্দিন কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। গুলির তাড়বে কাঁচের আঘাতে আমার ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এসময় জানালা দিয়ে অনর্গল গুলি আসা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শুয়ে পড়েন। আমিও শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর সাময়িকভাবে গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে বঙ্গবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়লাম। ওপর থেকে কাজের ছেলে সেলিম ওরফে আবদুল বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবী ও চশমা নিয়ে এলো। পাঞ্জাবী ও চশমা পরে বঙ্গবন্ধু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি (বঙ্গবন্ধু) বললেন আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি এত গুলি চলছে তোমরা কি কর? এসময় শেখ কামাল বলল আর্মি ও পুলিশ ভাই আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। কালো পোশাক পরা একদল লোক এসে শেখ কামালের সামনে দাঁড়ালো। আমি (মোহিতুল) ও

ডিএসপি নূরুল ইসলাম খান শেখ কামালের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নূরুল ইসলাম পেছন দিক থেকে টান দিয়ে আমাকে তার অফিস কক্ষে নিয়ে গেল। আমি ওখান থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি গুলির শব্দ শুনলাম। এসময় শেখ কামাল গুলি খেয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়লেন। কামাল ভাই চিৎকার করে বললেন, আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল, ভাই ওদেরকে বলেন। আক্রমণকারীদের মধ্যে কালো পোশাকধারী ও খাকি পোশাকধারী ছিল। এসময় আবার আমরা গুলির শব্দ শোনার পর দেখি ডিএসপি নূরুল ইসলাম খানের পায়ে গুলি লেগেছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম আক্রমণকারীরা আর্মির লোক। হত্যাকাণ্ডের জন্যই তারা এসেছে। নূরুল ইসলাম যখন আমাদেরকে রুম থেকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন তখন মেজর বজলুল হুদা এসে আমার চুল টেনে ধরলো। বজলুল হুদা আমাদেরকে নিচে নিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড় করালো। কিছুক্ষণ পর নিচে থেকে আমরা বঙ্গবন্ধুর উচ্চকণ্ঠ শুনলাম। বিকট শব্দে গুলি চলার শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। শুনতে পেলাম মেয়েদের আত্মচিৎকার, আহাজারি। এরইমধ্যে শেখ রাসেল ও কাজের মেয়ে রুমাকে নিচে নিয়ে আসা হয়। রাসেল আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে মারবেনা তো। আমি বললাম না তোমাকে কিছু বলবে না। আমার ধারণা ছিল অতটুকু বাচ্চাকে তারা কিছু বলবে না। কিছুক্ষণ পর রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে রুমের মধ্যে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেদিন রাসেলের আত্মচিৎকারে খোদার আরশ কেঁপে উঠলেও টলাতে পারেনি খুনী পাষণদের মন। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মত এই নিষ্পাপ শিশুকেও পাঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ’ গ্রন্থে রাসেলকে হত্যার এই নৃশংস বর্ণনা দিয়েছেন। এম এ ওয়াজেদ মিয়া তার গ্রন্থে লেখেন বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যার পর রাসেল দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকজনের কাছে আশ্রয় নেয়। রাসেলের দীর্ঘকাল দেখাশুনার দায়িত্বে থাকা আবদুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিলেন। একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কথা বলে রমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে নেয়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে তাকে না মারার জন্য আল্লাহ’র দোহাই দেয়। রাসেলের এই মর্মস্পর্শী আর্তিতে একজন সৈন্যের মন গলায় সে তাকে বাড়ির গেটে সেন্ট্রিবক্সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এর প্রায় আধ ঘণ্টা পর একজন মেজর সেখানে

রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতলায় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দুরন্তপ্রাণ শেখ রাসেল এমন সময়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন যখন তার পিতার রাজনৈতিক জীবনকে দেখতে শুরু করেছিলেন মাত্র। এরপর মেজর বজলুল হুদা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের গেটে দাড়িয়ে থাকা মেজর ফারুককে বলে অল আর ফিনিশড।

অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ফারুক রহমানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে তিনি বলেন, খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অভিযান পরিচালনা করেন। ওই বাসভবনে অভিযানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল রশিদ দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গভবনে, অবসরপ্রাপ্ত মেজর ডালিম ছিলেন বেতার কেন্দ্রে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সামরিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন করেছেন তিনি (ফারুক) নিজেই।

মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত অপশক্তির ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা একের পর এক চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী উচ্চাভিলাষী কয়েকজন সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যবহার করেছে ওই চক্রান্তেরই বাস্তব রূপ দিতে। এরাই স্বাধীনতার সূতিকাগার বলে পরিচিত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে হামলা চালায় গভীর রাতে। হত্যা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারকে। বিশ্ব ও মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সেদিন তারা কেবল বঙ্গবন্ধুকেই নয়, তার সঙ্গে বাঙালির হাজার বছরের প্রত্যাশার অর্জন স্বাধীনতার আদর্শগুলোকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। মুছে ফেলতে অপপ্রয়াস চালিয়েছিল বাঙালির বীরত্বগাঁথার ইতিহাসও। বঙ্গবন্ধুর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য করুণ বিয়োগগাঁথা হলেও ভয়ঙ্কর ওই হত্যাকাণ্ডে খুনিদের শাস্তি নিশ্চিত না করে বরং দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আড়াল করার অপচেষ্টা হয়েছে। এমনকি খুনিরা পুরস্কৃতও হয়েছে নানাভাবে। হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ জারি করেছিল বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার মোশতাক সরকার।

১৯৭৬ সালের ৮ জুন ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে অভিযুক্ত হত্যাকারী গোষ্ঠীর ১২ জনকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হয়েছিল

১. লে. কর্নেল শরিফুল হককে (ডালিম) চীনে প্রথম সচিব,

২. লে. কর্নেল আজিজ পাশাকে আর্জেন্টিনায় প্রথম সচিব,
৩. মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদকে আলজেরিয়ায় প্রথম সচিব,
৪. মেজর বজলুল হুদাকে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সচিব,
৫. মেজর শাহরিয়ার রশিদকে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় সচিব,
৬. মেজর রাশেদ চৌধুরীকে সৌদি আরবে দ্বিতীয় সচিব,
৭. মেজর নূর চৌধুরীকে ইরানে দ্বিতীয় সচিব,
৮. মেজর শরিফুল হোসেনকে কুয়েতে দ্বিতীয় সচিব,
৯. কর্নেল কিসমত হাশেমকে আবুধাবিতে তৃতীয় সচিব,
১০. লে. খায়রুজ্জামানকে মিসরে তৃতীয় সচিব,
১১. লে. নাজমুল হোসেনকে কানাডায় তৃতীয় সচিব,
১২. লে. আবদুল মাজেদকে সেনেগালে তৃতীয় সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশঃ বাংলাদেশের ইতিহাসের আরেক কালো অধ্যায় খুনিদের বাঁচানোর জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর স্ব-ঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ (যিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন) ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। ‘দি বাংলাদেশ গেজেট, পাবলিশড বাই অথরিটি’ লেখা অধ্যাদেশটিতে খন্দকার মোশতাকের স্বাক্ষর আছে। মোশতাকের স্বাক্ষরের পর আধ্যাদেশে তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এইচ রহমানের স্বাক্ষর আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর মোশতাক নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন। অধ্যাদেশটিতে দুটি ভাগ আছে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বলবত আইনের পরিপন্থী যা কিছুই ঘটুক না কেন, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টসহ কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় অংশে বলা আছে, রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে যাদের প্রত্যয়ন করবেন তাদের দায়মুক্তি দেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না। এরপর ক্ষমতায় আসে আর এক সামরিক শাসক মেজর জিয়া। তিনি ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সামরিক আইনের অধীনে দেশে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ

সহ চার বছরে সামরিক আইনের আওতায় সব অধ্যাদেশ, ঘোষণাকে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আইনি বৈধতা দেন। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে যা বলা হয়েছিল, “১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, ও অন্যান্য আইন, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোনো ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে তাহা, এবং অনুরূপ কোনো ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোনো আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতাবলে, অথবা অনুরূপ কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোনো আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোনো দণ্ডদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত, বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐ সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। পাঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেন খন্দকার মোশতাক। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ দেশের ইতিহাসে বর্বরতম হত্যার তদন্ত কার্যক্রম স্থগিত করে দেন এবং খুনীদের দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার পাশাপাশি কূটনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করেন, যা লন্ডনে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে। এসব হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়াকে যে সমস্ত কারণ বাধাগ্রস্ত করেছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তবে সেই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং কমিশনের একজন সদস্যকে ভিসা প্রদান না করায় এ উদ্যোগটি সফল হতে পারেনি। সেজন্য সে সময়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধান জিয়াউর রহমান কেই দায়ী করা হয়।

তথ্য সংগ্রহেঃ মাসুদুল করিম অরিয়ন।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান বাচ্চু

(যুদ্ধকালীন কমান্ডার, ৯ নং সেক্টর)

সিনিয়র সহ-সভাপতি, নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামীলীগ।

আজ হতে শতবছর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর জন্মের সময় তার মা-বাবার উপস্থিতিতে মুখে মধু দিয়ে তাঁর নানা বলেছিলেন তোমরা দেখে নিও আমার নাতি জীবনে অনেক বড় হবে। কিন্তু নাতি যে কত বড় হবে কোথায় গিয়ে নাতির সীমানা শেষ হবে এটা বঙ্গবন্ধুর নানা আর ধারণা করতে পারেননি এবং তিনি দেখেও যেতে পারেননি। তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে বঙ্গবন্ধুর পিতা এবং মাতার। বঙ্গবন্ধুর জীবনের উত্থান তার পিতা এবং মাতা দেখে গিয়েছেন। জীবনভর তারা তাদের খোকাকে (বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলায় ডাক নাম ছিল খোকা) নিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধু জেলে গিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে তাঁরা টেনশনে থাকতেন। তাদের শেষ জীবনে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং বাংলাদেশের জাতির পিতা হিসেবে, এটাই তাঁদের জীবনের সফলতা। আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতির কথা মনে পড়ে। আমি বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেছি ১৯৫৩ সালে, মাস টা আমার ঠিক মনে নেই তবে জুলাই-আগস্ট হবে। বঙ্গবন্ধু বগুড়ার আলতাফুন্নেসা মাঠে জনসভা করতে গিয়েছিলেন। আমার আব্বা সরকারি চাকরিরত অবস্থায় বগুড়ায় ছিলেন। আমাদের বাসার কাছেই বগুড়ার সেই বিখ্যাত আলতাফুন্নেছা মাঠ। সেই মাঠে আমি বঙ্গবন্ধুর জনসভা দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সাথে স্টেজে ছিলেন বাংলার আর এক বাঘ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক সাহেব। সেদিন কিছু না বুঝলেও মনোযোগ দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম বক্তৃতার সময়। বক্তৃতা তো নয় যেন মুখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার ভাবার্থ তখন কিছু বুঝি নাই কিন্তু এটা বুঝেছিলাম যে তাঁর বক্তৃতা আমাকে শিহোরিত করেছে। এরপর আমি বঙ্গবন্ধুকে

দেখেছি ১৯৫৬ সালে। আমি তখন ক্লাস থ্রী বা ফোরে পড়ি। তিনি নারায়ণগঞ্জের বর্তমানে জামতলা একটা ঈদগাহ ময়দান আছে এই ঈদগাহ ময়দানে বঙ্গবন্ধু মিটিং করতে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন আতাউর রহমান খান সাহেব, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, আরো অন্যান্য নেতারা যাদেরকে আমি তখন চিনতাম না। এখানেও বঙ্গবন্ধু জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। ইফ্ফান্দার মির্জা তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম খুব ভালো লাগলো আমার ভিতর থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি একটা টান এসে পড়ল। এরপর বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি নারায়ণগঞ্জে এসেছিলেন, বর্তমানে দুই নম্বর রেলগেট এর সামনের যে বর্ষণ সুপার মার্কেট ও জনতা ব্যাংক আছে ওই জায়গাটা তখন মাত্র বালু দিয়ে ভরাট করেছে, ১৯৬২ সালে উনি এখানে মিটিং করলেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব ওনার সাথে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পরে ওই মিটিংয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব কিছু বক্তৃতা দিলেন আমার মনে আছে, আইয়ুব খান তখন দেশের প্রেসিডেন্ট, মার্শাল ল চলে আইয়ুব খানের, সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বক্তৃতায় বলেছিলেন “নেমক হারাম নেমক হালাল বলে একটা কথা আছে, তুই বেটা আমার বডিগার্ড ছিলি আর তুই আমাকে বেটা জেলে নিলি” এটা উনি বলেছিলেন ক্ষুদ্র হয়ে কারণ ১৯৫৭ সালে উনি যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তার চীফ সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন আইয়ুব খান। এরপর বঙ্গবন্ধুকে দেখি ১৯৬৭ সালের বর্তমান চাষাড়া যেখানে জিয়া হল, তখন এটা ছিল বালুর মাঠ, এই মাঠের মধ্যে বঙ্গবন্ধু মিটিং করতে আসলেন, মিটিং এ উনি বললেন “পাকিস্তানের এক নেতা আছে যার আগেও খান পরেও খান, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, অনেক বড় বড় কথা বলেন কিন্তু কোন কথা তিনি রাখেন না”। এরপর বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ এ আবাবো নারায়ণগঞ্জে মিটিং করলেন নির্বাচনী মিটিং। বঙ্গবন্ধু সবসময় কৌতুক করে বক্তব্য রাখতেন, সকল মানুষ নীরব হয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনতো, মাইলের পর মাইল দূর হতে পায়ে হেঁটে এসে, চারটার মিটিং এমনকি দুইটার সময় মাঠ ভরে যেত মানুষের ভীড়ে। সেই মিটিং-এ যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন পিছনেই ছিল রেললাইন বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার সময় রেল যাওয়া-আসা করতে ছিল, বঙ্গবন্ধু তখন বলেছিলেন “আমি যখন বক্তৃতা দেই তখন ট্রেন আসে আর যায় আসে আর যায়”।

এরপর বঙ্গবন্ধুর সাথে আমি সফরসঙ্গী হয়েছি। আমার মনে পড়ে ১৯৬৯ এ নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবন্ধু সিলেট রওনা হলেন। আমি ও আমার ভাই নারায়ণগঞ্জের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক যাকে ১৯৮১ সালের ৩

নভেম্বর ভোর রাতে আওয়ামী লীগ অফিসে বিএনপির সন্ত্রাসীরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, উনি ছিলেন আমাদের নেতা, আমরা এখনো যারা জেলা কমিটির মধ্যে নেতৃত্বে আছি যাদের ৭০উর্ধ্ব বয়স হয়ে গিয়েছে আমরা সবাই মনিরুল ইসলাম ভাইয়ের শিষ্য। মনিরুল ভাই আমাদেরকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনির ভাইকে অত্যন্ত আদর করতেন এবং ওনার কথা বঙ্গবন্ধু মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বঙ্গবন্ধু মনির ভাইকে বললেন “মনির ঠিক সাতটার সময় ডেমড়া ঘাটে উপস্থিত থাকবি” তখন সিলেট যেতে হলে ডেমড়ায় ফেরি ছিল ওই ফেরি পার হতাম ওখান দিয়ে গিয়ে তারপরে মেঘনা ফেরি ছিল, দাউদকান্দি ফেরি ছিল, তারপর ময়নামতি হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে সিলেটে যেতে হতো। আমরা রওয়ানা হলাম ঠিক সাতটার সময় ডেমড়া ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। যিনি আমাদেরকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ৭০-এ নারায়ণগঞ্জের আওয়ামীলীগের এমপি হয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জের প্রখ্যাত ব্যবসায়ি এয়ার ভুইয়া সাহেব এর ছেলে আব্দুস সাত্তার ভুইয়া আমাদের প্রিয় বাদশা ভাই। উনি ওনার নিজস্ব গাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে রওনা হলেন বাদশা ভাই নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করেছিলেন। ঠিক সাড়ে সাতটা নাগাদ বঙ্গবন্ধু ঘাটে আসলেন আমরা ফেরিতে উঠলাম, ফেরিতে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি ওঠার পর নেতৃবৃন্দের কিছু গাড়ি উঠলো, সাথে সঙ্গী হলেন খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। যখন ফেরি ছাড়বে এমন সময় বঙ্গবন্ধু বললেন “একটু দেরি করো”, আমাকে বঙ্গবন্ধু ডাকলেন “এদিকে আয় দুই প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়” বঙ্গবন্ধু ক্যাপটান সিগারেট খেতেন আমি আনতে যাব তখন বঙ্গবন্ধু আবার ডাকলেন “এই শোন, একটা দিয়াশলাই সাথে আনিস”। বঙ্গবন্ধু যে হুকুমটা আমাকে করলেন আমাকে বললেন আমার জন্য সিগারেট আনবি দিয়াশলাই আনবি, আমি নিজেকে ধন্য মনে করি বঙ্গবন্ধুর মতো একজন বিশ্বনেতা আমাকে হুকুম করেছিলেন। ফেরি পার হয়ে রওনা দিলাম, আজকের প্রজন্মের যারা তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে বিশাল জনতা বঙ্গবন্ধুকে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এরপর কাঁচপুর মোড়ে বিশাল জনসভা হলো, পরে মদনপুর তারপর মোগরাপাড়া চৌরাস্তা তারপর ইলিয়টগঞ্জ, চান্দিনা এরপর ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট তারপর কোম্পানিগঞ্জ বাজার, দেবিদ্বার, কুটি চৌমুহনী, সুলতানপুর এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পৌছলাম। প্রত্যেকটা জায়গায় হাজার হাজার লোকের সমাবেশ বঙ্গবন্ধু কোন বিরক্তি প্রকাশ ছাড়াই সব জায়গায় জনসভা করেছেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে এসে দীর্ঘ সময়

ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছে একটিবার তাকে দেখার জন্য তার মুখের দুটি কথা শোনার জন্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত ৮ থেকে ১০ জায়গায় বঙ্গবন্ধু পথসভা করেছেন। সেই পথসভা আজকালকার যেকোনো জনসভা থেকে অনেক বেশি জনসমাগম হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কোনরকম ইতস্ততা বা বিরক্ত প্রকাশ না করেই গাড়ি থেকে নেমে অস্থায়ী স্টেজে উঠে তার বক্তব্য রেখেছেন। প্রত্যেকটা বক্তব্যেই বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন তা জনগণের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধুর যে কতটা টান ছিল, মানবতার খাতিরে বঙ্গবন্ধু যে কি করতে পারতেন, তার ছোট একটি উদাহরণ দেই।

১৯৬৯ সালে একটা টর্নেডো হয়েছিল যে টর্নেডো ডেমরা বাওয়ানী জুট মিলের দেয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিলো চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং কুমিল্লার দেবিদ্বার ও মুরাদনগর থানা তে অনেক লোকজনের ক্ষতি হয়েছিল অনেক লোকজন মারা গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এদের জন্য এক লঞ্চ বোঝাই করে রিলিফ নিয়ে রওয়ানা হলেন পাগলা ঘাট থেকে। আমরা খবর পেলাম উনি যাবেন আমাদের সোনারগাঁয়ের এখান দিয়ে, কালাপাহাড়িয়া আড়াইহাজারের ভিতর দিয়ে বঙ্গবন্ধু ঢুকবেন। বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন যাওয়ার সময় লঞ্চের মধ্যে আমাদের নারায়ণগঞ্জের আরেক নেতা মো নাসেম সাহেব বললেন মুজিব ভাই একটু দেখেন এই গ্রামটা একদম ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা বাড়িঘরও নাই হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু যাবেন এই খবর পেয়ে, বঙ্গবন্ধু নিঃশব্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের দেখলেন লঞ্চ ভিড়তে বললেন।

বঙ্গবন্ধু লঞ্চ থেকে নেমে কিছু ঘরবাড়ি দেখলেন এরপরে গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব কে বললেন “গাজী টিন কতগুলো আছে”, গাজী ভাই বললেন ২৫০ বাড়িল টিন আছে ভাই। “টিউবওয়েল কতগুলো আছে”, গাজী ভাই উত্তর দিলেন ১৫০ টা। বঙ্গবন্ধু গাজী ভাইকে বললেন “টিন ও টিউবওয়েল সমস্ত ঘরে ঘরে বিলিয়ে দাও, তারা যাতে ঘর উঠাতে পারে এবং টিউবওয়েল বসাতে পারে সেই ব্যবস্থা করো”। প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে টিউবওয়েল বসে গেল, ঘরের চালে টিন উঠে গেল, মোনাসেম সাহেবকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, এবং গাজী ভাইকে বললেন, “তুমি বাই রোডে ঢাকা যাও রিলিফ নিয়ে আসো ওখানকার জন্য” আমি লঞ্চ মুরাদনগর যাচ্ছি। কালাপাহাড়িয়ার মানুষেরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ৫২/৫৩ বছর ধরে এখনো আওয়ামী লিগের প্রত্যেকটা নির্বাচনে ওই এলাকার প্রত্যেকটা কেন্দ্রের লোকেরা আওয়ামী লীগের বাইরে ভোট দেন না।

বঙ্গবন্ধুর যে একটা মানুষের প্রতি টান মানুষের প্রতি মমতা ছিল তা যারা দেখেন নাই তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। আমি অনেক বক্তব্যে বলি বঙ্গবন্ধু একজন রাজনীতিবিদ, বঙ্গবন্ধু একজন রাজনৈতিক কবি, বঙ্গবন্ধু একটা মহাকাব্য লিখে গিয়েছিলেন যার নাম বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত এমন একটা গ্রাম ছিলনা এমন একটা জায়গা ছিল না যার সাথে বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় আত্মীয়তা ছিল না।

এই ছিলেন ‘বঙ্গবন্ধু’ উনি আমাদের একটা দেশ দিয়ে গেছেন একটা পতাকা দিয়ে গেছেন আমরা একটা পাসপোর্ট পেয়েছি।

বঙ্গবন্ধুর শ্রোতৃধারায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা এখন একটা অনুন্নত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের অনেক দেশের সাথে প্রতিযোগিতা দিতে পারবে আমাদের এই বাংলাদেশ নিয়ে। আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেক হায়াত কামনা করি।

তোমরা যারা আমার এই স্মৃতিচারণগুলো পড়ছো, বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যারা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী তোমাদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ রইলো, ৭১ এ বাংলার আপামর জনগণ বিশেষ করে যুব সমাজ, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছিল তার একটা ছোট ঘটনা তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। এঘটনা জানার পর তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, আশা করি তোমরা সেটা রাখবে। তোমরা অনেকেই আগে জেনেছো মোংলা পোর্ট এর কাছে ৭১ এ আমার ক্যাম্প ছিলো, জায়গাটার নাম বাজুয়া বাজার। সেখানে নজির মিয়া নামে এক ভদ্রলোকের বিরাট একটা বাড়ী ছিলো। মার্চ মাসে যখন ঐ এলাকায় পাক আর্মি ঢুকে ছিলো তখন প্রথম দিনই তারা সেই নজির মিয়াকে হত্যা করে। নজির মিয়ার বিরুদ্ধে স্থানীয় মাদ্রাসার ততকালীন ধর্ম ব্যবসায়ীরা অভিযোগ দিয়েছিল যে তিনি আওয়ামীলীগের তৎকালীন উঁচু মানের নেতা। তার পরিত্যক্ত বাড়ীটিতেই আমরা ক্যাম্প করেছিলাম। আমার সাথে ৯০ জন বেঙ্গল রেজিমেন্টের, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারের সদস্য ছিল এবং ৪২ জন ছিল সাধারণ ছাত্র জনতার মধ্যে থেকে যারা ভারতীয় ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে এসেছিল। বাজুয়াতে আমাদের সাথে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক বড় মনের মানুষ এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় ছিলেন। আমরা তাকে ফরিদ নানা বলে ডাকতাম। যেদিনের ঘটনা বলছি সেদিন ছিল

৬ অথবা ৭ ডিসেম্বর। ভারত বাংলাদেশকে ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়েছিল, এর আগেই আমরা এই অঞ্চলকে মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম। কারো সাথে যুদ্ধ নেই আমরা লোকাল এডমিনিস্ট্রেশন রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি এমন সময় ফরিদ নানা ক্যাম্পে আসলেন, তখন ফরিদ নানার বয়স ছিলো ৪৯ বা ৫০ বছর, তিনি এই বয়সেও মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং আমার গ্রুপেই উনি এসেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ার সুবাদে সেক্টর কমান্ডার ওনার কথা রাখতেন এবং ফরিদ নানার অনুরোধেই আমাকে ঐ গ্রুপের প্রধান করা হয় এবং ফরিদ নানাই আমাদেরকে রাস্তা চিনিয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বাজুয়া বাজার ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিলেন। ওখানে আসার পর আমাদের সাথে রাজাকারদের অনেক সম্মুখ যুদ্ধ হয়েছিল। এলাকা মুক্ত করার পরে আমরা লোকাল এডমিনিস্ট্রেশনটা চালিয়ে যাচ্ছি, তা না হলে ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমরা চলে গেলে লুকিয়ে থাকা রাজাকাররা ডাকাতি ও লুটপাট করতো, এজন্য সেক্টর কমান্ডারের আদেশ না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষায় থাকতাম। ফরিদ নানা একদিন এসে বললেন, নানা আমি তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো। আমি বললাম বলেন নানা। ফরিদ নানা বললেন, নানা.. এই এলাকাটা খৃষ্টান ও হিন্দু এলাকা মুসলমানদের বাড়িঘর এখানে খুবই কম। এখানকার লোকজন এখন এখানে নেই কিন্তু নানা খুবই কষ্ট লাগে, ফসলের ক্ষেতগুলোর দিকে তাকালে, জমির ধানগুলি পেকে রয়েছে, পাকা ধানের ভারে ধানগাছ মাটিতে নুয়ে পড়েছে। হাজার হাজার বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নানা তুমি যদি একটা ব্যবস্থা করতে, তোমার সাথে যে মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাদের দিয়ে যদি ধানগুলি একটু কাটিয়ে দাও তাহলে এখানকার যারা ভারতের শরণার্থী শিবিরে আছে তারা যখন ফিরে আসবে তখন তাদের খাদ্যের অভাব হবে না। নানা তুমি এই কাজটা একটু করো। আমি নানাকে বললাম আপনি একটু বসেন আমি দেখছি। আমি আমার টুআইসি যার নাম ছিল রফিকুল ইসলাম উনি পুলিশের হাবিলদার মেজর ছিলেন, আমি রফিক সাহেবকে বললাম ঘটনাটা, এটা মানবতার ব্যাপার আমাদের ছেলেরা তো বসে আছে, ওরা যদি ধানগুলো কেটে দিত। রফিক সাহেব বললেন স্যার আপনি একটা কাজ করেন, আমাদের দলে যত মুক্তিযোদ্ধা আছে সকলে আপনাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে ও আপনার কথা মনেপ্রাণে শোনে এবং আপনাকে তারা আন্তরিকভাবে ভালোবাসে, আমি সকলকে আপনার সামনে ডেকে আনি আপনি ওদেরকে একটু ব্রিফ করলে আশা করি ওরা এটা করবে। উনি ক্যাম্পের সামনের মাঠে সকলকে দাড় করালেন, আমি তখন সকলের উদ্দেশ্যে বললাম এই

দেশকে রক্ষা করা হলো আমাদের সকলের কাজ, দেশের মানুষের জীবন বাচাতে, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি আমাদের জীবনকে আমরা বিলিয়ে দিয়েছি, কোথায় আমাদের বাড়িঘর কোথায় আমাদের বাবা মা, কে কোথায় কিভাবে আছে, এখান থেকে আমরা কিভাবে বাড়ী যাব, সেটাও আমরা জানি না। তবে যুদ্ধ এখন থেমে গিয়েছে কানাঘুসা চলছে কয়েক দিনের মধ্যে পাক আর্মি হয়তো স্যারেন্ডার করবে। তখনতো শরণার্থী শিবিরে যারা আছে তারা দেশের মাটির জন্য পাগল হয়ে দেশে চলে আসবে, তখন এরা খাবে কি?

ফরিদ নানাকে তোমরা সবাই চিনো অনেকদিন যাবত আমাদের সাথে আছেন, উনি একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। এখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি এখানের ক্ষেতে হাজার হাজার মণ ধান পেকে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে, আমরা যদি এই ধান কেটে মজুদ করে দেই তাহলে শরণার্থী শিবিরের লোকেরা এসে পাবে এবং তখন তাদের খাবার চাহিদা মিটবে। কারণ আমাদের সরকার গঠন হলে কতদিন পর এদের কাছে রিলিফ আসবে তা জানা নেই ততদিন এরা না খেয়েই অনেকে মারা যেতে পারে। ফরিদ নানার সাথে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি ওই এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন, ফরিদ নানা উঠে বললেন তোমরা পরিশ্রমটা করো আমরা যতটুকু পারি তোমাদেরকে পারিশ্রমিক দেব, আমার কাছে কিছু টাকা আছে এবং এই চেয়ারম্যান সাহেবের কাছেও কিছু টাকা আছে তা দিয়ে আমরা তোমাদেরকে যতটা পারি পারিশ্রমিক দেব।

আমি তখন বললাম তোমাদের মতামত আমাকে জানাও, তোমাদের মতামতের উপর আমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তখন আমার দলের মুক্তিযোদ্ধারা বলল স্যার আমাদেরকে ১০ মিনিট সময় দেন। আমি তাদের সময় দিলাম, আমার ওখানে বারোটা গ্রুপ ছিল প্রতি গ্রুপে ১০ থেকে ১২ জন করে মুক্তিযোদ্ধা ও একজন গ্রুপ কমান্ডার ছিল। তখন সকল গ্রুপের কমান্ডাররা বসে তারা আলাপ-আলোচনা করে আমার কাছে এসে বলল আমরা একজন একটু কথা বলব স্যার, আমি বললাম বল, একজন বলল স্যার আপনি আমাদেরকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন এটা আমাদের করা কর্তব্য এবং এটা আমাদের ডিউটির মধ্যে পড়ে, তাই এটা আমরা করব। আমরা সবাই একমত, তবে স্যার আমাদের একটা শর্ত আছে আপনার কাছে। আমি চিন্তা করলাম ওরা আবার কি শর্ত বলে, কি দাবি করে তারা, আমি বললাম ঠিক আছে বলো তোমাদের শর্ত, ওরা বললো স্যার আমরা যুদ্ধের মধ্যে জীবন দিতে এসেছি আসার সময় আমাদের যারা

আত্মীয়-স্বজন আছে তাদেরকে বলে এসেছি যে তোমরা দোয়া করো আমরা যেন দেশের স্বাধীনতা আনতে পারি, আমরা যেন দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে পারি, তো স্যার আমরা তো টাকার লোভে যুদ্ধ করতে আসি নাই, যত সময় লাগে যত ধান আছে আমরা কেটে দেব, আমরা ধান মাথায় করে যেখানে রাখতে বলেন সেখানে পৌঁছে দেব কিন্তু স্যার একটা কথা, পারিশ্রমিকের কথা আপনারা বলবেন না। এ ধান কে খাবে? যাদেরকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করতে এসেছি যাদের জন্য জীবন দিতে এসেছি তারাই তো খাবে, তাদের অনুসংস্থান করার জন্যই আমরা এটা করব, আমাদের মাফ করবেন স্যার আমরা কোন পারিশ্রমিক নিব না। আর স্যার একটা কথা আমরা ক্যাম্পে খাচ্ছি, আল্লাহ যেভাবে হোক আমাদের খাবার খাওয়াচ্ছেন এখানে নানারা যেন কোন খাবারের ব্যবস্থাও আমাদের জন্য না করে। আমি চুপ করে বসে রইলাম আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আজকের প্রজন্ম যারা আছে তোমরা চিন্তা করতে পারো কি?

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তারা কতটুকু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, এই বাংলার যুবসমাজ নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল দেশের জন্য জীবন দিতেও লাইন ধরে ছিল কার আগে কে জীবন দিবে -তার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। আমি তখন আর কোন কথা বলতে পারলাম না আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল, এরপর তারা বলল, স্যার আমাদের হুকুম করেন কখন যেতে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বলছি। এরপর আমি নানাকে বললাম ধান কাটার জন্য কাঁচি লাগবে, বোঝা বহন করতে হলে দড়ি লাগবে, কাঁচি ও দড়ির ব্যবস্থা করে দেন। নানা বললেন কাঁচির ব্যবস্থা কিছু করা আছে বাকি ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি যথা সময় সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। জায়গাটা লাউডুগ ইউনিয়নের মধ্যে ছিল সেখানে আমরা গেলাম, সত্যি আশ্চর্য লাগল হাজার হাজার মণ ধান ক্ষেতে পড়ে আছে, গ্রামে কোন লোক নাই, কোন জন নাই, পাখিরা এসে এগুলো খাচ্ছে। যাহোক, ৪ থেকে ৫ দিনেই একশত ত্রিশ বত্রিশ জন মুক্তিযোদ্ধা মিলে সব জমির ধান কেটে ফেললাম। আমিও কাঁচি দিয়ে ধান কেটেছি খুব একটা কঠিন কাজ না। গাছের গোড়াটা ধরে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছি, যেখানে কেটেছে সেখানেই রেখেছি, যে যত ধান কেটেছে, তার বোঝা সে নিজেই বেঁধেছে, শুধু বোঝা মাথায় উঠাতে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করেছি। চার থেকে পাঁচ দিনে আমরা প্রায় তিন-চার হাজার মণ ধান কেটে এনে মজুদ করলাম পরে সেই চেয়ারম্যান ও ফরিদ নানা বললেন যাক এখন পানি চলে আসলেও আমাদের আর ভয় নেই, ধান পচার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের

হাতে ও মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন, আমরাও আত্মতৃপ্তিতে খুব খুশি মনে ক্যাম্পে ফেরত আসলাম আর ভাবলাম এত লোকের খাবার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে আসতে পেরেছি।

তোমাদের কাছে আগেই বলেছি তোমাদের জন্য আমার একটা উপদেশ আছে একটা অনুরোধ আছে। উপদেশটা হচ্ছে এই যে যুদ্ধের শেষ হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫০ বছর। আর এই ৫০টা বছরে চলে গিয়েছে অর্ধেকের বেশি মুক্তিযোদ্ধা দুনিয়া ছেড়ে। তোমাদের কাছে অনুরোধ আশেপাশে তোমরা যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা পাও তবে তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তাদের থেকে দোয়া নেয়ার চেষ্টা করবে। এই চরিত্রের মানুষ বাংলাদেশে আর কখনো জন্মগ্রহণ করবে না এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি। কারণ এই জন্য যে, আমরা যে দলের নেতার অনুপ্রেরণায় জীবনবাজি রেখে, জীবন দিতে গিয়েছিলাম দেশের স্বাধীনতার জন্যে এবং আমরা ছিনিয়ে এনেছি স্বাধীনতা, কিন্তু সেই দলের নেতারা এখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কোন মূল্যায়ন করেনা। শুধু একমাত্র মূল্যায়ন পাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার কাছ থেকে এবং উনার জন্য আমরা কিছুটা সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি। একুশটা বছর সেই পাক প্রেতাচারী এ দেশটাকে শাসন করেছে, এ সময় আমরা যে মুক্তিযোদ্ধা তা মুখে আনতে পারতাম না, বলতেও পারতাম না, বহু মুক্তিযোদ্ধাকে তারা মেরে ফেলেছে, বহু মুক্তিযোদ্ধা সৈনিককে তারা ফাঁসি দিয়েছে এবং সেন্ট্রাল জেলে মেরেছে। আজ আমরা বঙ্গবন্ধুর কন্যার জন্য সম্মান নিয়ে ভালোভাবে সম্মানের সাথে বেঁচে আছি। আমি দোয়া করি তার জন্য, তিনি যত দিন বেঁচে থাকেন, দেশের শাসনভার উনার হাতে থাকবে, ততদিন আমরা সকলে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারব এটা আমি নিশ্চিত।

তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইলো মুক্তিযোদ্ধাদের তোমরা যেখানে পাও তাদেরকে তোমরা সম্মান করো, ভবিষ্যতে তোমরা যেন বলতে পারো আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পেয়েছিলাম, উনি আমাকে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করেছিলেন। আর মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে তাদের চরিত্রটাকে যদি তোমরা অনুসরণ করতে পারো এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে যদি তোমরা লালন করতে পারো তবে এই দেশ অবশ্যই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাবে।



বীর মুক্তিযোদ্ধা এফ.এম. আখতারুজ্জামান

চরগোয়ালী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরেও পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করায় এবং বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণে, বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সারাদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল ও মিটিং শুরু হয়। আমি তখন বিনাইদহ নিউ একাডেমির ১০ম শ্রেণির ছাত্র। আমার মেজভাই জনাব এফ. এম. আবদুর রব বিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর ছিলেন। মেজভাই সাহেবের বাসায় থেকেই আমি বিনাইদহ নিউ একাডেমিতে পড়াশোনা করেছি। নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৭১ইং সালের SSC পরীক্ষার্থী হিসেবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত করেছি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর থেকে। তারপর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি গ্রামের বাড়ি চরগোয়ালী চলে আসি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ আওয়ামীলীগের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ জনতার জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে ও প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর দাউদকান্দির জনগণ ও ছাত্রসমাজ মুক্তিযুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে শুরু করে। দাউদকান্দির দক্ষিণ অঞ্চলের ৭/৮ টি গ্রামের তরুণদের সমন্বয়ে, সুন্দলপুর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ চরগোয়ালী ফকির বাড়ির বাসিন্দা আমার জেঠা জনাব আবদুস সালাম ফকিরের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি (এফ. এম. আখতারুজ্জামান) অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি।

বড়গোয়ালী গ্রামের দরিয়া সওদাগরের দিঘির পশ্চিম পাড়ে চন্দ্রকুমার সাহা বাড়ি। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন এলাকার স্বার্থান্বেষী মহলের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখন সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় আবদুস সালাম ফকির বিপনদের সাহায্যার্থে, তাদের সকলকে চরগোয়ালী ফকির বাড়িতে এনে আশ্রয় দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংখ্যালঘু হিন্দুরা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের আওতায় নিরাপদে ও নির্ভয়ে অবস্থান করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা যার যার বাড়ি ঘরে ফিরে গিয়েছে। সংগ্রাম পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় এবং জনাব আবদুস সালাম ফকিরের তত্ত্বাবধানে চরগোয়ালী ফকির বাড়ির জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা খাওয়ার জন্য একটি গোপন ক্যাম্প বা ঘাঁটি গড়ে তোলা হয় বিএলএফ কমান্ডার জনাব আলী আশ্রাফ মজুমদারের সহযোগিতায়। এই ক্যাম্পের অধীনে স্থানীয় তরুণদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে ৫/৭ জন তরুণকে HE- 36 হ্যান্ড গ্রেনেড নিস্ফেপের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরে ২০জন তরুণকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল/ মার্ক ফোর রাইফেল, এস.এম.জি, স্টেনগান ও এল.এম.জি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য তৈরি করা হয়। অনেক মুক্তিযোদ্ধা নিয়মিত এই ক্যাম্পে যাতায়াত করেছে। একাত্তরের মাঝামাঝি জুন মাসে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব শওকত আলীর নেতৃত্বে ২০ সদস্যের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল সার্বক্ষণিকভাবে এই ক্যাম্পে অবস্থান করেছে। দাউদকান্দি থানা হানাদার মুক্ত হওয়ার পর, (১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রি.) তাঁরা শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসে চলে যায়। দাউদকান্দি থানার শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসে (বর্তমানে শহীদনগর ট্রমা সেন্টার) অবস্থানকারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প থেকে চরগোয়ালী ফকির বাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের দূরত্ব ছিলো মাত্র ৫ কিলোমিটার। শহীদনগর থেকে সরাসরি দক্ষিণ দিকে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে চরগোয়ালী ফকির বাড়ির অবস্থান। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার সহ চরগোয়ালী ফকির বাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। খবরটি পাওয়া মাত্র বাড়ির মহিলা ও ছোট বাচ্চাদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয় এবং পুরুষরা বাড়িতে অবস্থান করেছে। হানাদারদের মোকাবিলা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রস্তুতি নিয়ে সবাই অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে থাকে। তখন রাস্তাঘাট তত উন্নত ছিল না। শহীদনগর মেইন রোড থেকে সুন্দলপুর বাজার পর্যন্ত মাটি দিয়ে তৈরি একটি কাঁচা রাস্তা ছিল। রিক্সা, স্কুটার, ভ্যানগাড়ী ও ছোট যানবাহন চলাচল করত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সুন্দলপুর

বাজার পর্যন্ত আসে, তারপর তাদের গন্তব্য পরিবর্তন করে সুন্দলপুর গ্রামের মিয়া বাড়িতে ঢুকে। আবদুল লতিফ মিয়ার বসত ঘরে ও তার ভতিজা নসু মিয়া ডাক্তারের বসত ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। জনাব আবদুল লতিফ মিয়ার ছেলে মো. মাহফুজ মিয়া ও তার ভতিজা মো. নাসির উদ্দীন মুক্তিযোদ্ধা ছিল তাই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারেরা চরগোয়ালী গ্রামের দিকে না এসে, শিবপুর গ্রামের উপর দিয়ে মুদাফর্দি গ্রাম হয়ে তাদের গন্তব্য স্থানে চলে যায়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চরগোয়ালী ফকির বাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য আর সুযোগ পায়নি।

১৯৭১ সালের ২০শে নভেম্বর ছিল (ঈদুল ফিতর) রোজার ঈদের দিন। চরগোয়ালী ফকির বাড়িতে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধারা ঈদ করার জন্য যার যার বাড়ি চলে গিয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহযোগিতায় সুযোগ বুঝে শেষ রাতের অন্ধকারে জামালকান্দি গ্রামে ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ করেছে। আক্রমণ করার পেছনে কারণ হলো, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য খান

সাহেব এম ওসমান আলীর গ্রামের বাড়ি জামালকান্দি ও তার প্রতিষ্ঠিত জামালকান্দি ওসমানিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় সেখানেই অবস্থিত। হানাদারদের ধারণা ছিল ঈদের দিন মুক্তিযোদ্ধারা ঈদ করতে অনেকেই বাড়িতে যাবে। যারা ক্যাম্পে থাকবে তারাও সংখ্যায় খুব সামান্য হবে। এটাই আক্রমণ করার জন্য সর্বোত্তম সুযোগ। এই সুযোগ কাজে লাগাতেই হানাদার বাহিনী আক্রমণ করেছে, গোয়ালমারী ও জামালকান্দি গ্রাম দুটোতে। পাকিস্তানিরা এলোপাখাড়ি গুলি চালিয়ে, ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে পুরো এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খবরটি ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি। অনতিদূরে চরগোয়ালী ফকির বাড়ী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে খবরটি পৌঁছাতেও বেশি সময় লাগেনি। আমি ঈদের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পশ্চিম পাশে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসেছি। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখি একজন লোক কাদা পানিতে কর্দমাক্ত হয়ে, উদভ্রান্তের মতো ধান খেতের আইল ধরে ছুটে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এসে বলে, এই বাড়ির মুক্তিযোদ্ধারা কোথায়? তাদের খুব দরকার। আমি আগন্তকের কাছে জানতে চাইলাম কি ব্যাপার কি হয়েছে? সে আমাকে জানালো, আজকে খুব সকালে পাকিস্তানি আর্মি জামালকান্দি গ্রামে ঢুকে গুলি চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ মারছে। তাদের বাঁধা দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের

দরকার ছিল। সময় নষ্ট না করে সংবাদ বাহককে সাথে নিয়ে আমি জেঠা আবদুস সালাম ফকিরের কাছে গেলাম। তিনি সংবাদ বাহকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। এমন বিপদের মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পে না থাকায় আফসোস করলেন। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি শুনে, তৎক্ষণাত্ আবদুস সালাম ফকির আমাকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। আজকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ চরগোয়ালী জাতীয় ঈদগাহে অনুষ্ঠিত হবেনা। আজকের ঈদের নামাজ যার যার গ্রামের মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। আমি অন্যান্য গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ যাও, আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হও। আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখলে বেলা ১০.০০ টার মধ্যে চলে আসবে। তোমাকে নিয়ে ঈদের নামাজ পড়ব ইনশাআল্লাহ। আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। আমি সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে ঘরে গেলাম। কয়েকটি ঐ.উ ৩৬ ঐধহফ মৎবহ্ধফব সঙ্গে নিলাম। মা-বাবার সাথে দেখা করে দোয়া নিয়ে, দেরি না করে সংবাদ বাহককে সঙ্গে নিয়ে রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। ২৫/৩০ মিনিটে পৌঁছে গেলাম মহলুহা গ্রামে। সেখানে গিয়েই দেখি এক এলাহি কাণ্ড। মুক্তিযোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র কাঁধে নিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে, অগ্রহায়ণের ধান ক্ষেতের আইল ধরে, কাদা-পানিতে কর্দমাক্ত হয়ে। মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সামাদ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সুদূর রফারদিয়া থেকে এলএমজি হাতে ছুটে এসেছে। আজকে ঈদের উৎসবের পরিবর্তে যেন মুক্তিযোদ্ধাদের মরণ উৎসব হচ্ছে। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠেছে। বিরামহীন ভাবে গোলা-গুলি চলছে, আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। শত্রু হননের এই ভয়ংকর নেশা চোখে না দেখলে বুঝাবার কারো সাধ্য নয়! হানাদারদের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র গুলো মুহূর্তে গর্জে উঠছে। এলোপাখাড়ি গুলি চালাচ্ছে তারা। একটি মাত্র বুলেট যেকোন সময় চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে, সেই দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কারোর খেয়াল নেই। মরণের ভয় সবাই করেছে জয়, ইনশাআল্লাহ আমাদের জয় হবে সুনিশ্চয়। পাকিস্তানিদের তুলনায় আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল খুবই সীমিত কিন্তু মনোবল ছিলো অফুরন্ত। মুক্তিযোদ্ধারা মনোবলে বলীয়ান ছিলাম সবাই। ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে মনোবলকে কাজে লাগিয়ে সীমিত অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করেছি। আমাদের অস্ত্রবল ছিল সীমিত কিন্তু মনোবল ছিল অফুরন্ত। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে গ্রামের মা-বোনেরাও। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চলছে। ক্ষুধার্ত বলে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে

মুক্তিযোদ্ধাদের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। একজন সহযোদ্ধা গুলি চালানোর পর রাইফেলের চেম্বার থেকে গুলির খোসা অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারছিলেন না। আমি নিজেও খোসাটি খুলতে ব্যর্থ হয়ে একটি চিকন রডের জন্য একটি বাড়ীর ভেতরে গেলাম। একজন ভদ্রমহিলাকে একটি চিকন রড দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। ভদ্রমহিলা আমাদের মুখের দিকে তাকালেন, কাছে ডাকলেন আমাকে। স্নেহের চোখে বললেন, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই। সবাইকে ডেকে নিয়ে আসো। আমি তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি। এ কথা বলে তিনি ঘরে গেলেন। এক টিন মুড়ি এনে খেতে দিলেন, সঙ্গে দিলেন গুড়। আমাদের পশ্চিমের উঁচু ভিটির একটি ঘরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে উঠোনে পাটি বিছিয়ে বসে পড়লাম। কারণ গুলি চলছিল তখনো। সবাই সারারাত উপোষ, সকাল থেকেও কেউ কিছুই খায়নি। তাই গুড় মুড়ি আমাদের কাছে অমৃতের সমান মনে হলো। আমরা গোথাসে গুড় মুড়ি খাচ্ছি আর ভদ্রমহিলাকে শতকোটি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এমন সময় একজন বৃদ্ধ মহিলা এসে বললেন, পাঞ্জাবি গোলামের পুতদের কী ঈদ নাই? মা-বোন নাই? মায়-দয়া নাই? এমন ঈদের দিনেও আক্রমণ করে? বাবারা তোমরা মুক্তি, পাঞ্জাবীরা যাতে একজনও ফেরৎ যেতে না পারে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তোমাদের যেন জয় হয়। এরপর উনি আরও কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু সময়ের অভাবে আর শোনা হয়নি। আমরা আবার যুদ্ধে যোগ দেই। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। বেলা আশ্তে আশ্তে বাড়তে থাকে। বেলা ৯.০০ টার দিকে সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চরগোয়ালী ফকির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পায়ে হেটে চলেছি, ধান খেতের কর্দমাক্ত আইলের উপর দিয়ে। মনের গভীরে অনেক চিন্তা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, আমি যাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোপের মুখে রেখে যাচ্ছি, ফিরে এসে তাদের জীবিতাবস্থায় পাবো তো! এমনই অনেক কিছু এলোমেলো ভাবনা, ভাবতে ভাবতেই হেটে চলেছি। কখন যে চরগোয়ালী ফকির বাড়ির পশ্চিম পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, বলতে পারবো না। সামনে তাকিয়ে দেখি বাড়ির পশ্চিম পাশের পুকুর পাড়ে অনেক লোকজনের সমাগম। তাদের দেখে ভাবছি ঈদের জামাতের মুসল্লিরা হয়তো সমবেত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। অধীর আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন, আমার বাবা সর্ব জনাব মো. ফজলুল হক ফকির, জেঠা আবদুস সালাম ফকির, কাজীর কোনা গ্রামের মো. আফাজ উদ্দিন মোক্তার, সেন্দি গ্রামের মো.আলমাস চৌধুরী, সুকিপুর গ্রামের মো. রওশন আলী পাঠান, দশপাড়া গ্রামের মো. ইদ্রিস মিয়া মেসার

(পরবর্তী সময় চেয়ারম্যান) ও মো. বজলুর রহমান, ঢাকারগাঁও গ্রামের মো. আদম আলী সরকার, সুন্দলপুর গ্রামের আবদুল লতিফ মিয়া এবং আরো অনেক পরিচিত ও অপরিচিত মুখ। আমাকে সবাই ঘিরে দাঁড়ালেন যুদ্ধের খবর জানার জন্য। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আমাদের অনুকূলে। মতলব থানা কমান্ডার এম. এ. ওয়াদুদ তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে গোয়ালমারী গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহ গোয়ালমারী বাজারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা চতুর্দিকের গ্রামগুলো থেকে তাদের ঘিরে রেখেছি, পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। ইনশাআল্লাহ আমাদের বিজয় হবে সুনিশ্চিত। যুদ্ধজয়ের সম্ভাব্য আগাম খবর পেয়ে সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠেছে। আবদুস সালাম ফকির আমাকে তাড়া দিলেন ঈদের নামাজের জন্য তৈরি হতে তিনি বললেন, আজকে আমাদের সৌভাগ্য আমরা একজন যুদ্ধ ফেরৎ মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ঈদের নামাজ পড়বো। এরচেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি গোসল সেরে চরগোয়ালী জামে মসজিদ-এ সকলের সাথে ঈদের নামাজ পড়লাম। নামাজের শেষে ঘরে গিয়ে সেমাই খেয়ে, যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে জেঠা আবদুস সালাম ফকিরের সাথে দেখা করেছি। তিনি আমাকে বললেন, আজকে ঈদের দিনে মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় ঈদের নামাজ পড়বে, কোথায় শিরনী- ফিরনী, পায়েস খাবে তা হবার নয়, মরণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ভালো মন্দ কিছুই খেতে পারছে না। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কচি ডাবের ও সিদ্ধ ডিমের ব্যবস্থা করে রেখেছি। সবগুলো টুকরিতে রাখা আছে এবং এগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকজনও তৈরি আছে, তারা তোমার সঙ্গে যাবে। জেঠা আবদুস সালাম ফকিরের দূরদর্শিতার কথা ভেবে,

আমি বিস্মিত, হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর রওয়ানা হলাম রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে। ৪ জন তাগড়া যুবক আমাকে অনুসরণ করে হেটে চলেছে ৪ টি টুকরি মাথায় বয়ে নিয়ে। বেলা ১১.০০ টার মধ্যে মহম্মন গ্রামে পৌঁছে গেলাম। তখন হানাদার বাহিনী কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধ ডিমের সাথে কচি ডাবের পানি খেয়ে নিজেদের চাঙ্গা করে তুলছে। আবার পূর্ণোদ্যমে সবাই যুদ্ধে যোগ দিয়েছি। গোয়ালমারী বাজার থেকে প্রায় ১.৫ (দেড়) কিলোমিটার পূর্বদিকে মহম্মন গ্রামের একটি বাড়িতে আমরা ২০/২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল চালাচ্ছি। আমাদের সহযোদ্ধা রফারদিয়া গ্রামের মো. নুরুল ইসলাম শত্রুর বুলেট বিন্দু হয়ে শহিদ হন। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিশোধের

আগুনে জ্বলে উঠি এবং সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করতে থাকি। দিবাকর পশ্চিমাকাশের দিগন্ত রেখা যতই ছুঁইছুঁই করছে, যুদ্ধের গতিতে ততই ভাটা পড়ছে। রাতের অন্ধকারে একসময় আন্তে আন্তে যুদ্ধ থেমে যায়। হানাদার বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়। অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রাণ বাঁচিয়ে রাতের অন্ধকারে দাউদকান্দি পালিয়ে যায়। যুদ্ধশেষে যে ফলাফল দাঁড়ালো, জামালকান্দি গ্রামের গ্রামবাসি ৭/৮ জন, গোয়ালমারী বাজারের ইনসান পাগলি, অন্যান্য গ্রামের গ্রামবাসী ও মুক্তিযোদ্ধা সহ মোট ১৫/১৬ জন শহিদ হন। মতলব থানা কমান্ডার তৎকালীন ক্যাপ্টেন এম. এ. ওয়াদুদ সহ মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসী ১০/১২ জন আহত হয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা সহ প্রায় দুই শতাধিক হতাহত হয়েছে। গোয়ালমারী-জামালকান্দি যুদ্ধ ছিল ২ নম্বর সেক্টরের। ১৯৭১ সালে ৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা সদর পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করা হয়। একদিন পরে ৯ ডিসেম্বর দাউদকান্দি থানা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা হয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর যৌথ আক্রমণে হানাদার বাহিনী পিছু হটতে থাকে। নৌপথে ৪ টি জাহাজে করে হানাদার বাহিনী দাউদকান্দি থানা সদর থেকে নারায়ণগঞ্জের দিকে পালিয়ে যায়। শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসে অবস্থানকারী, এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী, পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর ৭ জন রাজাকার ছদ্মবেশে পালিয়ে যাওয়ার সময়, ষোলপাড়া গ্রামে গ্রামবাসির সহযোগিতায়, আমি তাদের আত্মসমর্পন করতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র (স্টেনগান ১টি, মার্ক ফোর রাইফেল ৬টি) উদ্ধার করেছি। অনতিদূরে দশপাড়া গ্রাম, সেখানে জনাব মোঃ ইদ্রিস মিয়া মেম্বারের বাড়ি। সেখানে তাদের নিয়ে যাই। ইদ্রিস মিয়া মেম্বার সাহেবের সহযোগিতা রাজাকার ও আগ্নেয়াস্ত্র গুলো চরগোয়ালী ফকির বাড়ির মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাত্রা করেছি, পথিমধ্যে সুন্দলপুর গ্রামের আব্দুল আজিজ সরকারের মেয়ে বতুল আপার অনুরোধে তাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করেছি। মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার (বতুল) আপা হলেন, (মুজিব বাহিনীর দাউদকান্দি থানা কমান্ডার) শহিদ মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের আপন বোন। বতুল আপা রাজাকারদের দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠেন এবং বলেন ভাই, এই রাজাকারদের বেইমানির জন্যই ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় আমার নজরুল ভাইকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। তারা দেশের ও জাতির শত্রু, আমার রাজাকার দেখার খুব ইচ্ছা ছিল ভাই, তোমার জন্যই আমার সেই ইচ্ছা আজকে পূর্ণ হলো। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন

এই দোয়া করি সবসময়। বতুল আপাকে শান্তনা দেওয়ার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি, শুধু অনুভব করেছি ভাইকে হারিয়ে বোনের অন্তরে কত কষ্ট, কতটা যন্ত্রণা, তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চরগোয়ালী ফকির বাড়ির মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি এবং এক সময় ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছেছি। একান্তরের ১০ই ডিসেম্বর, চরগোয়ালী ফকির বাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসে স্থানান্তর করা হলো। দাউদকান্দি সদরের অবস্থা সরজমিনে দেখার জন্য আমার সদ্যপ্রাপ্ত স্টেনগানটি সঙ্গে নিয়ে, সেখানে গিয়ে যা দেখেছি তা সত্যিকার অর্থে আমাকে হতাশ করেছে। সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো ও অগোছালো দেখছি। প্রশাসন বলতে তেমন কিছুই চোখে পড়লো না। দাউদকান্দি বাজার সহ যত্রতত্র লুটপাট চলছে। যে যেভাবে পারছে সেভাবেই নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে। তাদের বাঁধা দেওয়ার কেউ নেই যেন। তারপরও কেউ কেউ বাঁধা দিচ্ছে, বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। একটি বাস্তব ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের সেনাবাহিনী দাউদকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে তারু ফেলেছে। শত শত মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র কাঁধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি স্টেনগানটি কাঁধে ফেলে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখছি। C.O (Dev) অফিসে ঢোকার পথে এসেই আমি থমকে দাড়ালাম। অদূরে দেখতে পেলাম, লুটেরার দল আবাসিক এলাকার বাসাগুলো লুটপাট করে, লুণ্ঠিত মালামাল গাঁটুরীতে বেঁধে মাথায় বয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি স্টেনগান উঠিয়ে ধরে চিৎকার করে থামতে নির্দেশ দিলাম। লুটেরার দল থমকে দাঁড়ালো, পেছনে ফিরে আমার হাতে অস্ত্র দেখে গাঁটুরি মাটিতে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বড় বড় ৪টি গাঁটুরী ও ১টি বাইসাইকেল উদ্ধার করেছি। তাদের সহযোগিতায় মালামাল সামগ্রী রিস্ত্রায় করে, শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। আমি দাউদকান্দি C.O (Dev) অফিস থেকে উদ্ধার করা ৪টি গাঁটুরী নিয়ে শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসে আসার পর, মুক্তিযোদ্ধারা গাঁটুরী খুললে যে সমস্ত মালামাল পাওয়া গেল তা হলোঃ সিগার সেলাই মেশিন ৪টি, ওয়াল ঘড়ি ১টি, বাইসাইকেল ১টি, লেপ-তোশক, কম্বল, চাদর, কাঁথা বালিশ ইত্যাদি। শীতকাল আসন্ন প্রায়, মুক্তিযোদ্ধারা শীত নিবারণের জন্য, কম্বল চাদর, লেপ-তোশক, কাঁথা বালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা যতদিন পর্যন্ত এই ক্যাম্পে অবস্থান করেছে, ততদিন পর্যন্ত সবকিছু ব্যবহার করেছে। শহীদনগর ওয়ারলেস অফিসের ভবনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা

অনেকদিন অবস্থান করেছি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনীর (মিগ্রবাহিনী) কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯৫,০০০ (পঁচানব্বই হাজার) সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্ত ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্রের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং লাল সবুজের একটি জাতীয় পতাকা অর্জন করেছি। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের দামে কিনেছি প্রিয় স্বাধীনতা। যুদ্ধশেষে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়ে, যার যার অবস্থানে ফিরে গিয়েছে। আমিও বিএলএফ কমান্ডার জনাব আলী আশ্রাফ মজুমদারের কাছে আমার স্টেনগানটি জমা দিয়ে, SSC পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে, দাউদকান্দির গ্রামের বাড়ি চরগোয়ালী থেকে বিনাইদহ চলে যাই। পূনরায় লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়েছি এবং বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচে যশোর বোর্ডের অধীনে বিনাইদহ নিউ একাডেমি থেকে ১৯৭২ সালে SSC পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছি। ১৯৭৪ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে, ঢাকা কলেজ থেকে HSC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে B.A (Hon) পাস করেছি। ১৯৭৯ সালে চরগোয়ালী খ.না. আহমেদ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পত্র পেয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেছি। ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে B.ED. কোর্স কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছি এবং ১৯৮৫ সালে জামালকান্দি ওসমানিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পত্র পেয়ে যোগদান করেছি। ১৯৯৪ সালে জামালকান্দি ওসমানিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পত্র পেয়ে যোগদান করেছি এবং বিরতিহীনভাবে ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারী উক্ত বিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণ করেছি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

রতনকান্দি, হাবিবুল্লাহ নগর,
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

১৯৭১ সালে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়। তখন আমি আমার গ্রামের রতনকান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৭০ সালের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে ‘বাংলাদেশ’। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরিবার পরিজনের মায়া ত্যাগ করে জীবনপণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি জাতীয় পরিষদের ১৬০টি-তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ বিজয় লাভ করে। ৭টি মহিলা আসনসহ আওয়ামীলীগ মোট ১৬৭টি জাতীয় পরিষদের আসনের অধিকারী হয়। সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তখন পাকিস্তান ছিল ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের। তখন দেশে সামরিক শাসন চলছিল। দেশের সামরিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ৩০০টি আসনের ২৮৮টি-তে বিজয় লাভ করেছিল। গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছিল গণ ভোটে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়া আওয়ামীলীগকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানানো। কিন্তু পাকিস্তানের বিহারী শাসক এই গণভোটের রায়ে সম্মত হলেন না। তিনি বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দিতে নারাজ। তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। এই সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপলস পার্টি ৫টি মহিলা আসন সহ ৮৮টি আসনের অধিকারী হয়েছিল। অন্যান্য সব দল মিলে পেয়েছিল বাকি ৫৬টি আসন। ১১ জানুয়ারী ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট বাঙালিদের হত্যা করে হলেও সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

বাতিলের ষড়যন্ত্র করতে থাকলেন। ২২ ফেব্রুয়ারী '৭১ পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা আওয়ামীলীগ ও তাদের সমর্থকদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেনা বৈঠকে ইয়াহিয়া খান গোপন নির্দেশ দেন, “ওদের ৩ মিলিয়ন খতম করে দাও”। তাঁর ধারণা ছিল নির্ধাতন করে লাখ দুয়েক বাঙালি হত্যা করলেই আন্দোলন থেমে যাবে। ১৩ ফেব্রুয়ারী ৭১ ইয়াহিয়া মিথ্যা আশ্বাস দিলেন ৩ মার্চ ৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধুকে পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচন করা হয়। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান দুপুর ১২টায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণে ৩ মার্চে আহত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বে-আইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। বেতার ভাষণ শুনে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন। সারা দেশের অধিকাংশ লোক রাস্তায় নেমে এলেন। গোটা দেশ অচল হয়ে যায়। পাকিস্তানী পতাকা পোড়ান শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ৩ মার্চ কে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের নির্দেশ দিলেন। ছাত্রলীগ ও ডাকসু নিয়ে “স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ” গঠন করা হলো। বঙ্গবন্ধু ঢাকা এবং বাংলাদেশে ৫ দিনের জন্য হরতাল ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তাঁর মুখের একটি কথায় সারা পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে গেল। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগ উক্ত সভায় পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই পতাকাটি অনুষ্ঠানে উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় জাতীয় সংগীত হিসেবে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আমার সোনার বাংলা...” গানটি নির্বাচিত হলো। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও জাতির পিতা ঘোষণা দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো। পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। ৩ মার্চ থেকে অফিস আদালত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে। ৬ মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধু সহ বাঙালিদের সবাইকে শান্ত করার কুট কৌশল হিসেবে ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ '৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। তিনি বেতারে ভাষণ দেন। ঐ দিন তিনি বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে পরিচিত পাকিস্তানী আর্মিদের সব চেয়ে অমানবীয় নিষ্ঠুর লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করলেন ৭ মার্চ '৭১ তৎকালীণ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) রেসকোর্সের প্রান্তদেশে ওয়ারলেস হাতে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের উপস্থিতিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিট

বাঙালিকে অগ্নিমস্ত্রে দীক্ষিত করতে ঐতিহাসিক এক ভাষণ দিলেন এই ভাষণে তিনি বললেন- ... তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে.....রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্।” আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তবে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু বন্ধ করে দিবে। আমরা ভাতে মারবো আমরা পানিতে মারবো। সাতকোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবো না। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করো। আপনাদের যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন..... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা”। এই জনসভায় ঢাকাসহ সারা দেশের দশ লক্ষাধিক আওয়ামীলীগ নেতা কর্মী ও অন্যান্য ছাত্র জনতা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে মানুষের ঢল থেকে বার বার শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছিল - “জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু”। আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম...। এই দিন টিক্কা খান ঢাকায় আসেন। ৮ মার্চ সকালে রেডিও ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হলো। ঘরে ঘরে কালো পতাকা উড়ানো হলো। সারা দেশের মানুষ ৭ মার্চের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরোক্ষ স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বুঝতে পারলো। গোটা জাতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলো। নিরুপায় হয়ে ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে তখন পূর্বাঞ্চলের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দান করলেন। এই দিন শাহজাদপুরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও স্বাধীন বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হলো। সারা উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও ছাত্র-জনতা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শাহজাদপুরে জমায়েত হলো। এই দিন বিকাল ৩টায় বরেন্দ্র কাচারী বাড়ির ঐতিহাসিক বকুলতলায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পরিষদ সদস্য থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক সৈয়দ হোসেন মনছুর। সভায় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান হেলাল, মোঃ হাসিবুর রহমান স্বপন, মোঃ আজাদ রহমান, শাহজাহান, কোরবান আলী, বাকী মির্জা, আব্দুল গফুর সরবত ও শ্রমিক নেতা বিনোদ বিহারী জোয়ার্দার প্রমুখসহ সবাই উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সাবকমিটি করা

হয়। ঐ দিন পাক ছাত্রলীগের নাম বদলিয়ে শুধু ছাত্রলীগ রাখা হয়। ১৫ মার্চ নতুন কুট কর্ম-কৌশল নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রহসনমূলক আলোচনা শুরু করেন। অন্যদিকে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য বিমানে ও জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনতে থাকে এবং যুদ্ধ জাহাজে করে অস্ত্র চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বন্দরে নোঙ্গর করে। এ দিকে ইয়াহিয়ার পরামর্শে জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন ও রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চ লাইট পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনা ছিল নির্যাতন, জ্বালাও পোড়াও ও গণহত্যা করে লাখ দুয়েক বাঙালি হত্যা করে আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করা। ১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন। এই দিন বিকালে রতনকান্দি হাটখোলা মাঠে শাহজাদপুরের আওয়ামীলীগ নেতারা এসে ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমানকে আহবায়ক করে ১১ সদস্যের রতনকান্দি সংগ্রাম পরিষদের কমিটি গঠন করে দেন। অ্যাসেম্বলি স্থগিতের পর থেকে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা চলছিল। ১৯ মার্চ বিকাল থেকে রতনকান্দি হাটখোলা মাঠে ডামি রাইফেল ও লাঠি দিয়ে ভোলা সরকারের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২২ মার্চ-২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত করেন। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। জয় বাংলা বাহিনী পাঁচশতের অধিক সদস্য সামরিক কায়দায় মিছিল করে পল্টনে জমায়েত হয়। তারা সামরিক কায়দায় বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানায় এবং বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত একটি পতাকা উপহার দেয়। সব সরকারি অফিস ও বিদেশি দূতাবাস সমূহে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। বেতার ও টেলিভিশনে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতির জনকের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতীয় সংগীতের সাথে সাথে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ বিকাল পৌনে ৬টায় আলোচনা শেষ না করেই ভুট্টোকে রেখেই বিশেষ বিমানযোগে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন। তিনি ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে অপারেশন সার্চ লাইট পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়ে বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। রাত সাড়ে ১১টায় টিক্কা খান মর্টারশেল কামান যান ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র নিয়ে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু করে। তারা একযোগে পিলখানা, ইপিআর ক্যাম্প, রাজারবাগ, পুলিশ লাইন, জগন্নাথ হল, ইকবাল হলে অক্রমণ করে এবং ঢাকায় সর্বত্র গণহত্যা শুরু করে। নিরীহ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা, ইপিআর,

আনসার ও ছাত্র-জনতা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। পাকিস্তানী সৈনিকরা ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরোচিত জ্বালাও পোড়াও গণহত্যা চালায়। পাক হানাদাররা বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয় পালায়নরত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে বাঙালি জাতির উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। জাতির পিতা ইতিহাসের জঘন্যতম বাঙালি নিধন অপারেশন সার্চ লাইটের ভয়াবহতা দেখে ও শুনে পাকিস্তানিদের হানাদার হিসেবে আখ্যা দিয়ে রাত ১২:২০ মি: এ ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর নিজ বাড়িতে উপস্থিত নেতা কর্মীদের সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বার্তা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বার্তায় বলেন “...রাত ১২টায় বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন অতিক্রমিত হামলা করেছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহিদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। আমি শেখ মুজিবুর রহমান এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করছি। ... এই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন এবং আপনাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়েই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যতদিন পর্যন্ত শেষ পাকিস্তানি সৈন্য বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত না হয় এবং যতদিন পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয় না আসে ততদিন আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন... খোদা হাফেজ, জয় বাংলা। বঙ্গবন্ধু রাত ১২:২০ মি: এ সকলের সম্মুখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে শেষ বাণী প্রদান করেন। ২৬ মার্চ ৭১ সকাল ৭:০০ টায় শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা বার্তার টেলিগ্রামের একটি কপি হাতে পেয়েছিলেন। তিনি টেলিগ্রামটি থানার সবাইকে দেখান। তারপর টেলিগ্রামটি নিয়ে শাহজাদপুরের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রহমানের বাসায় যান। এম.পি.এ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান ইংরেজি লেখা স্বাধীনতা বার্তার টেলিগ্রামটির বঙ্গাণুবাদ করেন। কয়েকজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে দিয়ে টেলিগ্রামটি হাতে লিখিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাঠান। শাহজাদপুর শহরে ৩টি মাইক নামিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার বঙ্গাণুবাদ প্রচার করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, জয়দেবপুরসহ বিভিন্ন জায়গা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শাহজাদপুরের সর্বত্র জাতির পিতার আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণারও শেষ বাণীর কথা ছড়িয়ে পড়লো। আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে শাহজাদপুরে মিছিল হলো। জাতির পিতার স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ পেয়ে

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান করাচী বেতার কেন্দ্র থেকে এক বেতার ভাষণে শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বাণী প্রদানের পর হানাদার বাহিনীর একটি দল লে: কর্ণেল জেড এ খান ও মেজর বিল্লালের নেতৃত্বে কমাডো বাহিনী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে এসে রাত ১:৩০ মি: বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে লাহোর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ মার্চ দুপুরে আনুমানিক ১:১০ মি: চট্টগ্রাম আত্মবাদে অবস্থিত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি পাঠ করেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ হান্নান। তখন সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জয়দেবপুরসহ সারাদেশের সর্বত্র বাঙালি, সেনা, ইপিআর, আনসার ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। তখন জিয়াউর রহমান অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর ও বাঙালি সকল আর্মির সিনিয়র ছিলেন। ২৭ মার্চ বেতারে ভাষণ দেওয়ানোর জন্য পটিয়ার করাইল ডাঙ্গা থেকে মেজর জিয়াকে কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন বেলাল মোহাম্মদ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, আবুল কাসেম সন্দিপ ও অন্যান্যরা। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় জ্যেষ্ঠ সামরিক অফিসার হিসেবে ১০কি: ওয়াট মধ্যম তরঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মর্ম কথা নিজের ভাষায় বললেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন- I Major Zia, on behalf of our great National leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman do hereby declare independence of Bangladesh... তখন উপস্থিত ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, ক্যাপ্টেন অলি আহম্মদ, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ ও অন্যান্যরা। ২৮ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি বেতারে পাঠ করেন সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন শমসের মবিন চৌধুরী। ১৫ এপ্রিল শাহজাদপুরের আওয়ামী লীগ এম.পি.এ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান আমাদের রতনকান্দি গ্রামে তাঁর ভগ্নিপতি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। ১৬ এপ্রিল আমাদের গ্রামের ও আশেপাশের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও অন্যান্য সবাইকে নিয়ে রতনকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক কর্মী সভা করলেন- এই সভায় তিনি ঢাকার গণহত্যা সহ অপারেশন সার্চ

লাইটের নির্মমতার কথা বললেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের পরোক্ষ স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বললেন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বাণীর কথা বললেন। সভার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাপ্ত টেলিগ্রামের মূল কপি দেখালেন। তিনি বললেন ঢাকার অনেক আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যান্য সার্বিক অবস্থার কথা বললেন। সবাইকে পাক হানাদারদের থেকে দূরে থাকতে বললেন। তিনি বললেন দেশে বাঙালি সৈন্য ইপিআর আনসার ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামীরা প্রতিরোধ যুদ্ধ করছে। দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হলে দেশ পরিচালনার মূলনীতি হবে (১) গণতন্ত্র (২) সমাজতন্ত্র (৩) ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও ১১ দফার কথা বললেন। বাংলাদেশ সরকার গঠন হয়েছে। ভারত শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে। বঙ্গবন্ধু সবাইকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছেন। যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে বলেছেন। সবাইকে বাঁশের ও সুন্দরী কাঠের লাঠি বানাতে বলেছেন। আমি আগ্রহী সবাইকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়ানোর জন্য ভারত যাব। কারণ আমাদের কাছে তেমন অস্ত্র নাই। যে অস্ত্র আছে তা দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আমাদের গ্রামের ডা. অয়জুল হক। সভা মধ্যে তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনতার জন্য তাঁর দুই ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা দেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম প্রহরে সকালে টেলিগ্রাম পেয়ে সিরাজগঞ্জের এসডিও এ.কে শামসুদ্দিন সাহেব পুলিশের সহায়তায় অস্ত্রাগার খুলে দেন সব অস্ত্র সিরাজগঞ্জ সদরের এমএনএ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন তালুকদার, ছাত্রনেতা জনাব আব্দুল লতিফ মির্জা ও অন্যান্যদের দায়িত্বে ছেড়ে দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ২৮ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে আমাদের এলাকার চাকুরীজীবী ও অন্যান্যরা শহর ছেড়ে আমাদের গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামে চলে আসেন। সিরাজগঞ্জের এসডিও ও অন্যান্য সকল আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা বাঙালি সৈনিক ইপিআর ও আনসারদের নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ২৮মার্চ পাকিস্তানি হানাদারেরা উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার নগরবাড়ি ঘাট হয়ে পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও অন্যান্য শহর দখলে নেয়ার জন্য ফেরিতে আরিচাঘাট হয়ে নগরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। আমাদের পাবনা মহকুমার স্বাধীনতাকামীরা প্রতিরোধ করার জন্য নগরবাড়ি ঘাটে বাংকার করে পজিশন নিয়ে গুলি ছুড়লো। পাক হানাদার সৈন্যরাও ফেরী থেকে গুলি ছুড়তে লাগলো। স্বাধীনতা

কামীদের গুলির কাছে হানাদাররা পরাজিত হয়ে মধ্য নদী থেকে ফেরী ঘুরিয়ে আরিচা ফেরী ঘাটে ফিরে গেল। ১ এপ্রিল দুপুরে পাক হানাদারেরা পুনরায় আরিচা ঘাট থেকে ফেরী যোগে নগর বাড়ি ঘাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। বিমান থেকে নগর বাড়ি ঘাটে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উপর বোমা ফেলতে শুরু করলো। বোমার আঘাতে প্রতিরোধকারী যোদ্ধাগণ টিকতে পারলো না। তারা নগরবাড়ি ঘাটের পজিশন ছেড়ে দিয়ে ডাব বাগান (বর্তমানে শহীদনগর) নামক স্থানে বিশ্বাস কোম্পানীর বিশ্বাস বাড়িতে বাৎকার করে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য পজিশন নিলেন। সন্ধ্যায় ডাব বাগানে প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সৈনিকদের ভারী অস্ত্রের কাছে বাঙালি সৈনিক, ইপিআর, আনসার ও অন্যান্যরা টিকতে পারে না। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ৮ জন ইপিআর শহিদ হয়েছেন। ২৮ মার্চ পাক হানাদারের প্রতিরোধ করার জন্য সিরাজগঞ্জের এস.ডি.ও এ.কে শামসউদ্দিন এর নেতৃত্বে বাঙালি সৈনিক ইপিআর আনসার ও অন্যান্যরা বাঘাবাড়ি ঘাটে পজিশন নেয়। বাঘাবাড়ি ঘাটে পাক হানাদারদের প্রতিরোধ করার জন্য এস.ডি.ও স্যার, এম.পি.এ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, আব্দুল লতিফ মির্জা, মোঃ হাসিবুর রহমান (স্বপন), মোঃ খালেকুজ্জামান খান, আব্দুল বাকি মির্জা, মোঃ আজাদ রহমান শাহজাহান, মোঃ আব্দুল গফুর সরবত, মোঃ কোরবান আলী, শহিদুজ্জামান হেলাল (পরে শহিদ হন) সহ সিরাজগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী জমায়েত হয়েছিলেন। বাৎকারের মধ্যে পজিশন নিয়েছিলেন বাঙালি সৈনিক ইপিআর আনসার ও মুক্তিযোদ্ধারা। ২ এপ্রিল '৭১ দুপুরে পাক হানাদাররা বাঘাবাড়ি ঘাটের দক্ষিণ পাড় এসে এক শক্তিশালী মর্টার শেল ছাড়লো। মর্টারের বিকট শব্দ হলো। এই মর্টার শেলের ভয়ঙ্কর আওয়াজে গোটা এলাকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মর্টার শেলের গুলিটি গিয়ে পড়েছিল বাঘাবাড়ি থেকে ৪ মাইল দূরে পুঠিয়া গ্রামে। এই মর্টার শেলের আঘাতে পুঠিয়া গ্রামের ১ জন মহিলা মারা গিয়াছিল। ট্রেন যোগে উল্লাপাড়া স্টেশন হয়ে এবং বগুড়া থেকে সড়ক পথে অনেক পাক হানাদার সৈন্য বাঘাবাড়ি ঘাটের দিকে মার্চ করলো। সংবাদ পেয়ে অস্ত্র ও যোদ্ধার স্বল্পতা বিবেচনায় বাঘাবাড়ি ফেরীঘাটে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা পজিশন ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন। ৩ এপ্রিল ট্রেনযোগে সিরাজগঞ্জগামী পাক হানাদারদের সাথে মোঃ আব্দুল লতিফ মির্জার নেতৃত্বে উল্লাপাড়ার ঘাটিনা নামক স্থানে একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ৭ জন স্বাধীনতাকামী শহিদ হন। পোরজনা, চরকৈজুরী ও করশালিকা গ্রামে রাজাকার ক্যাম্প করা হল। সারা দেশে বাঙালি হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও বিভিন্ন প্রকার

নির্যাতন শুরু হলো। বেড়া থেকে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য লঞ্চ ভরে গিয়ে ডেমরা গ্রাম ঘিরে নিয়ে গুলি করে পাখির মত মানুষ মারলো। এই গণহত্যায় আমার চার দাদাসহ আট শতাধিক নারী-পুরুষ হত্যা করা হয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর ধর্মাত্মক মৌলবাদী নেতাদের নির্দেশ পেয়ে পোতাজিয়া গ্রামের মাহতাব আলী সরকার ও অন্যান্য গ্রামের কিছু উশ্জ্বল যুবক শাহজাদপুর গিয়ে প্রাণ গোপাল সাহা, গৌরকুন্ডু ও অন্যান্য হিন্দুদের দোকানের ও বাড়ির মালামাল প্রকাশ্যে দিবালোকে লুট করে নিলো। আমাদের গ্রামের মুসলমানরা ভাল ও অসাম্প্রদায়িক। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের কোন প্রকার ক্ষতি হতে দিল না। আমাদের গ্রামের একজন মানুষও পীচ কমিটিতে যোগ দেয় নাই এবং রাজাকার হয় নাই। গ্রামের মুসলমানগণ হিন্দুদের বাড়ি-ঘর পাহাড়া দিয়ে রাখলেন। আমাদের গ্রামের মোঃ আব্দুল সরকার মোঃ আকবর আলী প্রাঃ, মোঃ হোসেন আলী ও অন্যান্যরা সবাইকে ডেকে বললেন হিন্দুদের কোন প্রকার ক্ষতি করা যাবে না। তাঁরা আমাদের প্রতিবেশি ও আমানত। ১০ এপ্রিল '৭১ ভারতের পশ্চিম বঙ্গে সভা করে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক ঘোষণাপত্র জারি করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলো। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করা হলো। ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গতাজ তাজউদ্দিন আহমদ দেশ ও বিশ্ববাসীকে সরকার গঠনের কথা জানান ও সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান। ১৭ এপ্রিল '৭১ কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) সীমান্তবর্তী ভবের পাড়ার বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এম,এন,এ ও এম,পি এদের নিয়ে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। শপথ গ্রহণের পূর্বেই ঘোষিত হয় নতুন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র, যা বাংলাদেশের “স্বাধীনতা সনদ” নামে অভিহিত। বৈদ্যনাথ তলার নামকরণ করা হয় মুজিব নগর। এইজন্য বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে বলা হয় মুজিব নগর সরকার। বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর। তখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি হয়ে পাকিস্তানের কারাগারে থাকার কারণে জাতির পিতাকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, জনাব তাজ উদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনা), এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন) মন্ত্রী ও আরও ১ জন কে নিয়ে মোট ৬ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা

হয়। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে প্রত্যেক সেক্টরে একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হলো। ৬৪টি সাব সেক্টর করে সাব সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। জাতির পিতার অনুপস্থিত কালীন সময়ের জন্য উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করা হয়। ১২ এপ্রিল '৭১ ৪টি জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত কর্ণেল (অব:) মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানি মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, কর্ণেল (অব:) আব্দুর রব, এম,এন,এ চীফ অব স্টাফ ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ,কে খন্দকার ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। মনোনীত হওয়ার পর প্রধান সেনাপতি তাঁর পিস্তল থেকে আকাশ মুখে একটি গুলি করলেন এবং বললেন, “এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হলো। পাক হানাদাররা রাজাকার আলবদর, আল শামস ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘর পোড়ানো, লুটতরাজ, ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতন সহ জঘন্যতম মানবতা বিরোধী কাজ শুরু করলো। রাজাকারেরা গ্রাম থেকে জোর করে মুরগী, খাসি ও যুবতী মেয়েদেরকে ধরে এনে পাক হানাদার ক্যাম্পে দিত। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা দিত। হানাদারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। যে কোন পুরুষকে ধরলে পাক হানাদাররা বলতো “কাপড়া তোলা, চার কলেমা বাতাও, মালাউন কাহা হয়। মুক্তি ফৌজ কাহা হয়। পাক হানাদার সৈন্যরা পুরুষদের কাপড় খুলে তাদের লিঙ্গ পরীক্ষা করতো। যদি “মুসলমানি” করানো থাকতো তাহলে হয়তো বাঁচা গেলেও বাঁচা যেত তা না হলে অনিবার্য মৃত্যু। “জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার কোরবান আলীর নির্দেশে স্বাধীনতা বিরোধীরা রাত ৩টায় পুঠিয়া গ্রামের অধিবাসী খুকনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিতেন্দ্র চন্দ্রকে ধরে নিয়ে বর্বরোচিত নির্যাতন করে বাড়ির সামান্য দূরে গুলি করে হত্যা করলো। পোরজনা রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকাররা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পোরজনা গ্রামের মনীন্দ্রনাথ ঘোষকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। চরকৈজুরী রাজাকার ক্যাম্প থেকে রাজাকাররা এসে বেল তৈল গ্রামের অনিল ও সুনিল দুই সহোদর ভাইকে গুলি করে হত্যা করলো। রতনকান্দি হাটের দিন হাট ভরা লোকের মধ্য থেকে ধরে নিয়ে কয়েকজন রাজাকার ভৈরব পাড়ার নারায়ন চন্দ্র সরকারকে চোখ বেধে নৃশংসভাবে নির্যাতন করে দরগার চরে গুলি করে হত্যা করল। পীচ কমিটি ও পাক হানাদারদের নির্দেশে রাজাকাররা মাদলা গ্রামের কিছু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করালো। শাহজাদপুর সাহা পাড়ার একজন হিন্দু যুবতীকে জোর করে একজন রাজাকার ধর্মান্তরিক করিয়ে বিবাহ করে। ২৫ এপ্রিল সকালে চড়িয়া গ্রামে

গণহত্যা হয়। পাক হানাদাররা নির্বিচারে ১২৯ জনকে হত্যা করে। সিরাজগঞ্জ জেলায় লতিফ মির্জার নেতৃত্বে পলাশডাঙ্গা যুব শিবির নামক সবচেয়ে বড় মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করা হলো। ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রায় এক কোটি ভারতে আশ্রয় নেয়া লোকদের জন্য শরণার্থী শিবির স্থাপন করলো। কেহ কেহ ট্রেনিং নেয়ার জন্য ভারত গেলেন। আমাদের জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ হোসেন মনসুর সাহেব মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ নিলেন না। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শুধু দেশ মাতৃকাকে ভালবেসে জাতির পিতার নির্দেশ পালন করতে ১৫ আগস্ট '৭১ আমরা ৭২ জন যুবক একযোগে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট আব্দুর রহমানের সাথে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেয়ার জন্য ভারত গেলাম। নৌকা পথে রতনকান্দি থেকে যাত্রা করে সাতবাড়িয়া সুজানগর, পদ্মা পার হয়ে কুষ্টিয়া, জলঙ্গী বর্ডার পার হয়ে নদীয়া, নদীয়া থেকে বাসে মালদহ থেকে আমাদের কামারপাড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান সাহেব প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য কলিকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আমার বয়সের স্বল্পতার কারণে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করতে চাইলেন না। আমার সাথী শাহজাদপুরের এরশাদ ও রাজ্জাক ভাইয়ের সহযোগিতায় কামার পাড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক বেড়া সাঁথিয়ার এম.এন.এ অধ্যাপক আবু সাঈদ স্যারকে অনুরোধ করে ভর্তি হলো। আমার মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে রাজাকারদের আলটিমেটামে জীবন বাঁচাতে আমার গোটা পরিবার বাড়ি ঘর সব ফেলে ভারতে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কয়েক দিন কামারপাড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমার মার্চ পাস্ট করানো, জাতীয় সংগীত গাওয়া, অন্যান্য প্রশিক্ষণ হলো। আমাকে কামারপাড়া রিক্রুটিং ক্যাম্প থেকে কুড়মাইল এবং কুড়মাইল থেকে মালঞ্চ ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হলো। মালঞ্চ থেকে পতিরাম যুব ট্রেনিং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হলো। পতিরাম থেকে ট্রাক যোগে আমাদেরকে শিলিগুড়ি জেলার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলো। গাছে ঘেরা জঙ্গলের মধ্যে এই ট্রেনিং সেন্টার। তাবুর মধ্যে থাকা, ঝরনার জলে স্নান করা, লাইন ধরে খাবার নিয়ে খাওয়া। ট্রেনিং ক্যাম্পের চার দিকে বন। বনের মধ্যে আর বন মানুষের বসবাস। ওরা গুরুত্ব সম্প্রদায়ের মানুষ। ২১ দিন এই ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং হলো। এই ক্যাম্পে থ্রিনট থ্রি রাইফেল, গ্রেনেড, এল.এম.জি, এস.এল.আর, স্টেনগান, মর্টার ও অন্যান্য আগ্নেয় অস্ত্রের প্রশিক্ষণ হলো। বর্নার জল আসা শ্রোতের উত্তর পার্শ্বের মাঠে চানমারী হলো। মর্টার শেল চানমারী

হলো ট্রেনিং ক্যাম্পের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত খালের পশ্চিম পার্শ্বের অবস্থান থেকে। ফাষ্ট এইড, ক্রোলিং, রেকি অন্যান্য সকল বিষয়ে জ্ঞান দিলেন। ভারতীয় হিন্দু বিহারী ও শিখ সেনা আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ালেন। প্রশিক্ষক শিখ সেনা ডি.এস ভিলন জানালেন আমার এফ.এফ নং-৪৭৪২। প্রশিক্ষণ শেষে আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো ৭নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার পশ্চিম দিনাজপুরের তরঙ্গপুরে। তখন ৭ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লে. কর্ণেল কাজী নুরজ্জামান এবং আমাদের সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। রাস্তাঘাট চেনা একই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে আমাদের ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। গ্রুপ কমান্ডার নিযুক্ত হলেন বেলকুচি উপজেলার তামাই গ্রামের এম.এ মান্নান। ডেপুটি কমান্ডার নিযুক্ত হলেন জামিরতা গ্রামের রবীন্দ্র নাথ বাগচী। আমাদের নামে অস্ত্র ইস্যু করা হলো। গোলা বারুদ, মাইন ও এক্সপ্লোসিভ সহ সব দেয়া হলো। তরঙ্গপুর বাজার থেকে একটি শ্রী শ্রী চন্ডি গ্রন্থ, ১টি বাংলাদেশের জাতীয় পাতাকা ও ১টি ৪ ব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। আমাদের কার্য এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হলো সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানা ও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা। আমরা তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা বারুদ ও রেশনিং এ্যালাউন্স ও পকেট মানি নিয়ে বাস যোগে এক রেল স্টেশনে এলাম। সেখান থেকে ট্রেন পথে শিলিগুড়ি ও আসামের ধুপরি হয়ে গৌহাটি এলাম। গৌহাটি সেখান থেকে বাসে মানিকারচর। রাতে মানিকার চর বোডিং এ থাকলাম। পরের দিন সকালে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল রংপুর জেলার রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে এলাম। সারা দিন স্নান, খাওয়া-দাওয়া করে ওখানে থাকলাম। সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জের এম.এন.এ মোতাহার হোসেন তালুকদার ও শাহজাদপুর কলেজের অধ্যাপক সরফুদ্দিন আউয়াল আমাদেরকে হানাদার মুক্ত এলাকা সিরাজগঞ্জের চর সংলগ্ন টাঙ্গাইলের সিংগুলির চড়ে পৌছানোর জন্য একটি বড় ছইওয়ালা নৌকা রিজার্ভ করে দিলেন। আমরা রাতে নৌকার ডোরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ বাহাদুরাবাদ ঘাটের সম্মুখ দিয়ে কাজিপুর হয়ে টাঙ্গাইলের সিংগুলির চড়ে পৌছালাম। পরের রাতে যমুনা পার হয়ে বেলকুচি কামারখন্দের এম.এন.এ জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন তালুকদারের বাড়ি এলাম। এম,এন,এ স্যারের ভাই জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা বেলকুচি থানার বিভিন্ন গ্রামে থাকতে লাগলাম। আজ এ শেল্টার কাল সে শেল্টারে থাকলাম। রাতে আমরা শেল্টার পরিবর্তন করতাম। প্রতি রাতে কমান্ডার স্যার আমাদেরকে

পাসওয়ার্ড দিতেন। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে নিলাম। দিনের বেলা স্থানীয় আওয়ামীলীগদের সহযোগিতা নিয়ে বিভিন্ন থানা ও রাজাকার ক্যাম্প রেকি করতাম। প্রথম দিকে পাক হানাদারদের আতঙ্কিত করার জন্য সম্মুখ যুদ্ধ নয় হিট এন্ড রান পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গেরিলা আক্রমণ করতাম। হানাদারদের আতঙ্কিত ও পর্যুদস্ত করা ছিল আমাদের লক্ষ্য। “জয় বাংলা” ছিল আমাদের রণাঙ্গনের ধ্বনি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বলতে বলতে হানাদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। জয় বাংলা, বাংলার জয় গানটি ছিল আমাদের প্রিয় গান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত “বজ্রকণ্ঠ” অনুষ্ঠানটি আমাদের উজ্জীবিত করেছে। আমরা নিয়মিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম। দেশের অবস্থা বুঝে পরে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করলাম। রাজাকারদের বাড়িতে বাড়ির লোকদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার জন্য বুঝাতাম। আমাদের আশেপাশের গ্রামেই অবস্থান করতো জনাব মোঃ আমির হোসেন ভুলুর মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ। তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমরা যৌথভাবে আমার ও অন্যান্যদের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা এবং মুসলিমলীগ নেতা মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে বিজয়ী হয়েছিলাম। থানার অন্যান্য পুলিশ ও রাজাকাররা যমুনা নদীতে থাকা লঞ্চ নিয়ে পালিয়েছিল। বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধে ৩ জন পুলিশ ও ২ জন রাজাকার মারা গিয়াছিল। ২ জন রাজাকারকে ধরে এনে ছিলাম, মতিন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রুপের মোঃ আব্দুল হামিদের রেকিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ব্রীজ পাহাড়ারত রাজাকার ক্যাম্প এ্যাম্বুস করেছিলাম। ট্রেন লাইনে ক্রোলিং করে মাইন বসিয়ে আসলাম। পাক হানাদার মিলেশিয়া ও রাজাকারদের টহলের সময় ওদের নজরে মাইন পড়লো। ওরা টর্চলাইট মেরে মেরে উর্দুতে বকাবকি করতে থাকলো এমন সময় ট্রেন ভর্তি মিলিটারী এসে পড়ায় যুদ্ধ করা সম্ভব হলো না। কমান্ডার স্যারের কমান্ডে তামাই সেন্টারে ফিরে আসি। পরের দিন হানাদারেরা এসে কালিয়া হরিপুর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ব্রীজ সংলগ্ন রাজাকার ক্যাম্প এ্যাম্বুসের পর গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেশী হওয়াতে কমান্ডার স্যার আমাদের গ্রুপকে দুইটি ভাগ করে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর কমান্ডধীনে একটি গ্রুপ করে দেয়া হলো। আমি পড়লাম রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর গ্রুপে। কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে আমরা চলে এলাম কল্যাণপুর গ্রামে। সারারাত পায়ে হেটে কল্যাণপুরে এলাম। কল্যাণপুরে সকালে প্রকাশ্যে পিটি প্যারেড করলাম। অস্ত্রে ফুলতরী মারলাম। দুই জন পাকিস্তানী দালাল

বেলকুচি থানায় সংবাদ দিয়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্য পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকারদের নিয়ে এলো। বওড়া গ্রাম হয়ে পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের দোসররা যখন আসতে ছিল আমরা তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আমরা কল্যানপুর গ্রামের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁশের ঝাড়ে ব্যাংকারের মত জায়গায় পজিশন নিলাম। পাক হানাদার ও তাদের দোসররা রাস্তা দিয়ে আমাদের পজিশনের কাছে আসতেই আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর কমান্ডে ফায়ার শুরু করলাম। পাক হানাদারেরা এক লাফে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পজিশন নিয়ে ফায়ার শুরু করলো। এক ঘন্টার মত যুদ্ধ হলো। পাক হানাদাররা ফায়ার করতে করতে পিছু হটলো। এই যুদ্ধে ৩ জন পাক মিলেশিয়া ও ১ জন রাজাকার মারা গিয়েছিল। এই যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য পাক হানাদার সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলো। দেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ ছিল আওয়ামীলীগের পক্ষে। আমরা একেক দিন একেক বাড়ি থাকতাম। দিনের বেলা তারা আমাদের গোপন করে রেখে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। রাতে আমরা পর্যায়ক্রমে দু'ঘন্টা করে আমাদের অবস্থান ডিউটি দিতাম। স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ আমাদের পাক হানাদারদের অবস্থান, রেকিতে সহযোগিতা, তথ্যসংগ্রহ সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন জেনারেল মনেকস। আমরা কয়েক দিন দৌলতপুর টেংগাশিয়া, খুকনি, বাজিয়ারপাড়া, দরগারচর থেকে ২৩ নভেম্বর ৭১ সৈয়দপুরের কালাচক্রবর্তীর বাড়ীতে সেন্টার নিলাম। ২৫ নভেম্বর ৭১ টাংগাইল যুদ্ধে পরজিত হয়ে পাক হানাদাররা ২ জন রাজাকারকে পথ চেনানোর জন্য সাথে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওরা যমুনা পার হয়ে মালিপাড়া এলো। মালিপাড়া থেকে পায়ে হেটে চরকৈজুরি হয়ে ওয়াপদা বাধ দিয়ে বেড়ানদী পাড় হয়ে ঢাকায় যাবে। আমাদের গ্রুপের ঐ দিন অবস্থান ছিলো সৈয়দপুর গ্রামে। আমরা খবর পেলাম পাক হানাদারদের আক্রমণ করার জন্য পিছু নিলাম। চর কৈজুরী এসে ক্ষুধায় ওরা একজনের মুলা খেতের মুলা তুলে কিছুটা খেল। ওরা হয়তো জানতো না মুলা এমনি খাওয়া যাবে না। তারপর মার্চ করলো। আমাদের গ্রুপ নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওদের ফলো করতে থাকলাম। পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকাররা ওয়াপদা বাধ দিয়ে বেড়ার দিকে পায়ে হেটে অগ্রসর হচ্ছিলো। আমরাও পিছু পিছু হাটছিলাম। ওরা খুব ক্রোধি এবং ভয়ংকর। ওরা ক্রোধ সামাল দিতে না পেরে ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওয়াপদার পূর্ব পাশে পজিশন নিয়ে আমাদের ওপর গুলি চালালো। আমরা ও সাথে সাথে ওয়াপদার পশ্চিম পাশে পজিশন নিয়ে

পাল্টা গুলি চাললাম। আনুমানিক বিকাল ৫ টার দিকে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাপি যুদ্ধ হলো। এর মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ওরা গোলাগুলি বন্ধ করল। আমরাও গুলি করা বন্ধ করলাম। শাহজাদপুর উপজেলা ও আশেপাশে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দলগুলো আমাদের সাথে ধীতপুর যুদ্ধে এসে যোগ দিলো। সারারাত আমরা ওয়াপদা বাধের পশ্চিম পাশে পজিশন অবস্থায় থাকলাম। রাতে ধীতপুর সারগুদাম থেকে মাঝে মধ্যে দুই একটা করে রাইফেলের গুলি আসছিলো। আমরাও মাঝে মধ্যে ২/১টা গুলি ছুড়ছিলাম। সকালে পজিশন অবস্থায় আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী, বেড়ার কমান্ডার মোঃ আমির হোসেন ও আরো কয়েকজন ক্রোলিং করে ধীতপুর সার গুদামে গেলেন। গিয়ে দেখলেন দুইজন রাজাকার আছে। তাদেরকে কমান্ড করে সারেভার করালেন। রাজাকার দু'জনের নাম ছিল লতিফ ও কালাম। রাজাকারদের কাছ থেকে জানা গেল তাদেরকে কভারিং ফায়ার করার নির্দেশ দিয়ে পাক হানাদাররা পজিশন থেকে ক্রোলিং করে নিরাপদ দূরত্বে এসে পায়ে হেটে রাতেই ভেড়াকোলায় ঐ দিকে অগ্রসর হয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল পাক হানাদারেরা ভেড়াকোলা গিয়ে জেলেদের ধরে নিয়ে বেড়ার খেয়া ঘাট পার হয়ে নদীর ওপারে গিয়ে নগরবাড়ী হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। এই যুদ্ধে বেড়ার আমীর হোসেনের গ্রুপের বৃশালিকা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুল খালেক শহিদ হয়েছেন। আর দুই জন পথচারী ওয়াপদা বাধের উপর মারা গেছেন। ৯ ডিসেম্বর, ৭১ আমি আমার রণাঙ্গনের সাথীদের নিয়ে বিজয়ীর বেশে আমার গ্রামের স্কুলে গেলাম। আমার স্কুলের সাথীরা আমাকে দেখার জন্য এলো বন্ধু-বান্ধব ও সাথীদের নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল এর উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উড়ালাম এবং জাতীয় সঙ্গীত গাইলাম। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ বেলা ৪টায় ডাঃ মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করে। পাক হানাদাররা এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতায় ৩০ লক্ষ লোক হত্যা করেছে এবং দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সন্তানহানী করেছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতা না পেলে পাকহানাদাররা এত অল্প সময়ে এত লোক হত্যা, নারী নির্যাতন ও অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারত না। ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সমস্যা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীর সমস্যা, করাচীর মিয়াওয়ালি ইয়াহিয়া কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুর প্রহসনমূলক বিচার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মস্কো সফর করেন এবং ২০ বছর মেয়াদী ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি করেন। ভারতীয় মিত্র

বাহিনী “অপারেশন জ্যাকপট” নামক আক্রমণে বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করে। ৪ মাস প্রহসনমূলক বিচারকার্য চলার পর পাকিস্তানের সামরিক আদালত ৩ ডিসেম্বর’৭১ বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়। পাক বিমানবাহিনী ভারতের বিমানঘাটিতে বোমা হামলা চালায়। পাকিস্তান যাতে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করতে না পারে সে জন্য ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। পাকিস্তানের সামরিক আদালতে এই রায় ঘোষণার দিনই ভুটান বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনী নিয়ে যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়। জাতির জনকের মৃত্যুদন্ডের আদেশ কার্যকরী করার পূর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন করার অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং আরোরা মুক্তি বাহিনীকে সংগে নিয়ে দূর্বীর বেগে পাকহানাদার বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়েন। ৬ ডিসেম্বর ’৭১ সোমবার বেলা ১০টায় ভারতীয় লোক ও রাজ্য সভা উভয় সংসদের সম্মতিতে তুমুল করতালির মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। ৮ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী বিমান আক্রমণ শুরু করে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে শাহজাদপুর বাঘাবাড়ী ও অন্যান্য জায়গায় রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পন করতে থাকল। হিন্দুদের বাড়ী ও দোকান থেকে লুট করা জিনিসগুলো তাঁদেরকে ফেরৎ দিয়ে লুটেরা গণক্ষমা চাইলো। শাহজাদপুর থানা পীচ কমিটির সভাপতি মাওঃ ছাইফুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস, সহঃ সভাপতি ব্যারিস্টার কোরবান আলী সহ পাকিস্তানী সৈন্যদের পক্ষ অবলম্বনকারীরা পালাতে লাগলো। কেউ কেউ পশ্চিম পাকিস্তানে, অন্যান্য দেশে ও দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য জায়গায় পালালো। ভারতীয় বিমান ও বোতার থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের আত্মসমর্পনের আহ্বান জানানো হলো। বিমান থেকে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের আত্মসমর্পনের আহ্বান জানিয়ে হাতিয়ার ডান দো। প্যাম্পলেট ছড়ালো। মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ২দিন পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর ’৭১ আলবদর, আল শামস বাহিনীর সহযোগীতায় জাতিকে মেধাশূন্য করতে পাকিস্তানি হানাদাররা বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের বাড়ী থেকে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ধরে আনা ৩০এর অধিক বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবিকে ধরে নিয়ে রায়ের বাজার ও মিরপুর বধ্যভূমিতে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। ১৪ই ডিসেম্বর শাহজাদপুর হানাদার মুক্ত হলো। সারা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে গণকবর ও বধ্যভূমি আছে। ১৬ ডিসেম্বর’৭১ ভারতীয়

সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকস এর নির্দেশে চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের দলিল নিয়ে দুপুরের পর ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান কর্নেল (অবঃ) এম.এ.জি ওসমানী ও চীপ অব স্টাফ মেজর জেনারেল আব্দুর রব তখন সিলেটের রণাঙ্গনে ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকারকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চীপ অব স্টাফ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার, ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার লেফট্যানেন্ট কর্নেল এ.টি.এম. হায়দার (তখন মেজর ছিলেন), ও মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক কাদের সিদ্দিকীসহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে নৃশংস বর্বরতার সমাপ্তির প্রতীকী হিসাবে ১০০ জন পাকিস্তানি আর্মি অফিসার মাটিতে অস্ত্র রেখে মাথা নিচু করে সোহরোয়াদী উদ্যানে দাড়িয়ে ছিল। পাকবাহিনী প্রধান আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীও কিছু সময় মাথা নত করে দাড়িয়ে থেকে রিভালবারটি পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং আরোরার কাছে দিয়ে আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষর করেন। তারপর বিজয়ী বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে যৌথ বাহিনী প্রধান জগজিৎ সিং আরোরা স্বাক্ষর করেন। সারাদেশে অবস্থানরত ৯৩ হাজারের অধিক পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষে আত্ম সমর্পন করেছিল। ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান বিজয় উল্লাসে স্বাধীন বাংলাদেশ সারা দেশ ঘুরে দেখে। ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জন হয়। বিজয় অর্জনের পরও কিছুদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। বিজয় অর্জনের ৮ দিন পর মুজিবনগর সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর আমাদের গ্রুপ জামিরতা হাইস্কুলে থাকার জন্য ক্যাম্প করি। শাহজাদপুর থানা ও প্রশাসন পরিচালনা করেন মুক্তিযোদ্ধাগণ। মোঃ আব্দুল বাকী মির্জা শাহজাদপুর থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। মোঃ খালেবুজ্জামান খান এর গ্রুপসহ শাহজাদপুর থানার বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ দিলরুবা সিনেমা হল, শাহজাদপুর কলেজ, ডাক বাথলো ও শাহজাদপুর হাইস্কুল সহ বিভিন্ন স্থানে থাকার জন্য ক্যাম্প করে। ৮ই জানুয়ারী ’৭২ পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও নয়াদিল্লিতে সংবর্ধনা নিয়ে ১০ই জানুয়ারী’৭২ বাংলাদেশে আসেন। ১১ই জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন, ঐ আদেশের মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ

করেন এবং পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ই জানুয়ারী'৭২ শুরু হয় জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনামল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পরিচালনা করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু সরকার ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীর মধ্যে চাল, গম ও অন্যান্য সাহায্য সরবরাহ করেন। ভারতীয় সৈন্যদেরকে এ দেশ থেকে চলে যেতে বলেন। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র জমা দিতে বলেন। জাতির পিতার আদেশ পেয়ে আমাদের গ্রুপ ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী রবিবার সিরাজগঞ্জ ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় অস্থায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমা নেয়া ক্যাম্পে সাব সেক্টর কমান্ডার মেজর গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীর সম্মুখে লেঃ সাইফুল্লাহ স্যারের কাছে অস্ত্র জমা দিলাম। প্রত্যেককে অস্ত্র জমা দেয়ার রশিদ নিয়ে আমাদেরকে বাড়ীতে চলে আসতে বললেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী'৭২ সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো। আমি সিরাজগঞ্জ এস.ডি.ও অফিসে গেলাম। আমার অস্ত্র জমা রশিদ ফেরৎ নিয়ে আমাকে মহান মুক্তিবাহিনীর সেনাবাহিনী প্রধান মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট নং-১২৯১৫৮, একটি সাদা কম্বল ও বকেয়া রেশন মানি ও পকেট মানি হিসাবে ২২০ টাকা দেয়া হলো। সরকারি উদ্যোগে মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের পশ্চিমপার্শ্বে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্প স্থাপন করা হলো। এস.ডি.ও অফিস থেকে ইচ্ছুক সব মুক্তিযোদ্ধাকে মিলিশিয়াতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি ন্যাশনাল মিলিশিয়ায় ভর্তি হলাম না। আমি বাড়ীতে চলে এলাম। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করে রতনকান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্র নাথ সান্যালের কাছ থেকে ৮ম শ্রেণির অটোপাশের টি.সি নিয়ে শাহজাদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম। ১২ই মার্চ ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেলেন।



বীর মুক্তিযোদ্ধা সুশীল বিকাশ নাথ

বারাবাকিয়া, পেকুয়া, কক্সবাজার

আমি যুদ্ধকালীন সময়ে ৪/৫ টি দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করবো যেখান থেকে দেশবাসীর দোয়ায় ও মহান সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে এখনো বেঁচে থেকে মহোদয়ার নিকট কলম ধরতে পারছি। দুর্ঘটনা-১. ১৯৭১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে আমরা ১নং সেক্টরের ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ নং তিনটি গ্রুপ একসাথে শপথ বাক্য পাঠ করে ত্রিপুরা হরিনা ক্যাম্প থেকে রামগড় হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। ফটিকছড়িতে রাজাকার ও পাক বাহিনীর সাথে খণ্ড খণ্ড কয়েকটা যুদ্ধ করতে করতে নিজ নিজ এলাকায় যাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে থাকি। আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার পথে পথিমধ্যে রাউজান/রাঙ্গুণীয়া থানার বেতাগী গ্রামে হালদা নদী পাড় হওয়ার সময় রাজাকারের সাথে গুলি বিনিময় হয়। আমরা ৪/৫ টা নৌকা ভাড়া করেছিলাম। আমাদের নৌকাগুলো নদীর মাঝখানে পৌঁছালে রাজাকারের গুলিবর্ষণের মুখে রণ্থতে না পেরে ধাক্কাধাক্কি করে নৌকা থেকে নামার সময় নৌকাটি পানিতে ডুবে যায়। তখনো রাজাকারদের গুলিবর্ষণ অব্যাহত থাকে। তখন মনে মনে ভাবছিলাম হয়তো আমাদের সবার সলিল সমাধি সেখানেই হবে। আমি কোনো রকমে কচুরিপানার সাথে মাথা লুকিয়ে পানিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এক হাতে অস্ত্র ও অন্য হাতে সাতার কেটে জীবন রক্ষা করি। কুলে ওঠার পর আমরা যখন বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকা থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করি তখন রাজাকাররা প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, সে সময় আমার কয়েকজন সহযোদ্ধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, চট্টগ্রাম-১৪ চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম চৌধুরী, চন্দনাইশ থানা কমান্ডার জনাব জাফর আলী হিরু, তৎকালীন পটিয়া থানা কমান্ডার আবু তাহের খাঁন খসরু, চকরিয়া থানা কমান্ডার মাহাবুবুর রহমান।

দুর্ঘটনা-২. আল্লাহ অশেষ রহমতে আমরা সেদিন সবাই অক্ষত থেকে বেতাগী বোয়ালখালী হয়ে আসার পথে করলডেঙ্গা পাহাড়ের কাছে জৈষ্টপুরা নামক গ্রামে একটা সেনবাড়ীর দ্বিতল মাটির ঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের রাখা বিশ্রামাগারে গ্রুপের এল.এম.জি. ম্যান মি. অর্জুন দাশ ও আমি সামনা সামনি বসে অস্ত্রের ফুলথু করার সময় অর্জুন দাশের এল.এম.জি. এর চেম্বারে থাকা একটি বুলেট অসাবধানতাবশত আমার ডানকান ঘেষে ফায়ার হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গেলেও অনেকদিন যাবত আমার ডানকান বধির অবস্থায় ছিল। মাত্র ১ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যবধান থাকায় দেশবাসী ও ঈশ্বরের কৃপায় সেদিনকার মত বেঁচে যাই। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত আমার ডানকানে মাঝে মাঝে যন্ত্রনা অনুভব করি।

দুর্ঘটনা-৩. উল্লেখিত আমরা তিন গ্রুপ বোয়ালখালীর পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে বর্তমান চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছলে আমরা দোহাজারীর জামীজুরীতে আলী হোসেন মাস্টারের খামার বাড়ীর সন্ধান পাই। তখন আমরা সবাই ওনার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে দোহাজারীতে অবস্থানরত পাক বাহিনীর ইনফরমার চেষ্টায় ফকির এর মাধ্যমে আলী হোসেন মাস্টারের খামার বাড়ীতে আমাদের অবস্থানের কথা জেনে যায়। সাথে সাথে তারা আমাদেরকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন আমাদের রেকিম্যান বাবু সুমন বড়ুয়ার মাধ্যমে জানতে পারি যে, তারা আমাদেরকে দিনের বেলায় আক্রমণ করবে। এ খবর অবগত হয়ে আমরা তখন আর্মির নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে এমবুশে চলে যাই। সারাদিন এমবুশে থাকার পরও তারা আসে নি। সন্ধ্যার পর আমরা এমবুশ উইথড্র করি এবং রাতের জল খাবার তৈরি করার জন্য কুতুবদিয়া নিবাসী মুক্তিযোদ্ধা পুলিন শীলকে দায়িত্ব অর্পণ করি। কিন্তু আমরা স্ব স্ব গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা নিজস্ব সিকিউরিটি ডিউটি ভাগ করছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে যখন অন্ধকার নেমে আসলো তখন পাক হানাদার বাহিনী আমাদেরকে দূর থেকে মটার শেলের মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করে। সাথে সাথে আমরাও পাল্টাপাল্টি আক্রমণ শুরু করি। সে সময় আমাদের কাছেও ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল। যেমন- ৩০৩, এমজি, এসএমজি, মর্টার, মাইন ও এক্সপ্লোসিভ। এই যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার মিলে ১০-১২ জন নিহত হন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদেরও দুইজন সদস্য স্পটেই মারা যান। তারা হলেন ০১. বিমল চৌধুরী ও ০২. সুভাষ মজুমদার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধকালীন সময়ে নিহত ঐ দুই সহযোদ্ধার ঠিক মাঝখানে আমি ছিলাম। দুই জন মুক্তিযোদ্ধার হাতে এমজি এর মতো ভারী অস্ত্র থাকার

পরও বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ম্যাগজিনে গুলি লোড করার সময় শত্রুপক্ষের গুলিতে তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু অলৌকিক ভাবে আমি বেঁচে যাই।

দুর্ঘটনা-৪. পরে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আরো গভীর জংগলে চলে গেলাম। দুইদিন পরে আমরা তিন গ্রুপের সহযোদ্ধারা একত্রিত হলাম। পরে আমরা জানতে পারলাম শঙ্কনদীর দক্ষিণ পাড়ে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্য বান্দরবান থেকে হেলিকপ্টার যোগে দোহাজারীতে এসেছে। আমরাও তাদের সাথে মিলিত হয়ে দোহাজারী পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে দখল করি হানাদার বাহিনীর লোকেরা পটিয়ার দিকে চলে গিয়েছিল। মিত্র বাহিনীর কমান্ডার মেজর গুরুং সিং আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, দোহাজারী ব্রিজের নীচে বাংকারে কতজন লোক নিহত হয়েছে তা দেখে আসার জন্য। আমি আমার দুইজন সহযোদ্ধা যথাক্রমে অর্জুন দাশ ও সন্তোষ দাশ কে নিয়ে ব্রিজের নীচে নামার সময় হঠাৎ কাটাতারের জালের সাথে স্পিগ খেয়ে আমি নিচে পড়ে যাই। তখন আমার হাতে ও পায়ে মারাত্মক জখম হয় শরীরের অধিকাংশ স্থানে চামড়া উঠে গিয়ে অজস্র রক্ত ঝড়তে থাকে। আমার এই অবস্থা দেখে মিত্র বাহিনীর একজন সৈন্য আমাকে কোলে নিয়ে দোহাজারী স্কুলের পিছনে হাজারী দীঘির পাড়ে একটি বটগাছের নিচে রেখে এমন একটি তৈল মালিশ করে দিলেন যার ফলে আমি দুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই। এখানে উল্লেখ্য যে, সেদিন আকাশ ভারী কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল।

দুর্ঘটনা-৫. আমরা ৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চকরিয়া সিএন্ডবি অফিসে ক্যাম্প করি। আমাদের কাজ ছিল সারাদিন রাজাকারদের নিকট থেকে অস্ত্র শস্ত্র জমা নেয়া। খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের ১৪-১৫ তারিখের দিকে কক্সবাজার থেকে মিত্রবাহিনীর অনেক সৈন্য চকরিয়া স্কুল মাঠে জড়ো হয়। তখন খুশিতে সাধারণ লোকেরা তাদের দেখতে গায়ের উপর উঠে যাওয়ার উপক্রম হলে তারা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। কারণ তারা বাংলা জানতেন না। আবার বাঙ্গালীরাও হিন্দি জানতেন না। তখন ভাষাগত সমস্যা থাকার কারণে তারা হিন্দি জানা ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর সদস্য খুঁজতে থাকেন। সেসময় আমি ৩/৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাধারণ লোকদের সরানোর জন্য প্রেরণ করি। এর মধ্যে চকরিয়ায় আমরা আছি জেনে আমার এক আপন জ্যেষ্ঠ কাকাতো ভাই মহেশ চন্দ্র দেবনাথ বারবাকিয়া থেকে আমাদের দেখতে চকরিয়াস্থ স্কুল মাঠে আসেন। ওখানে আমার আরেক জ্যেষ্ঠ কাকাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা ধনঞ্জয় দেবনাথ ভারতীয় মিত্রবাহিনীর নিরাপত্তার সশস্ত্র দায়িত্বে ছিলেন।

গ্রাম থেকে আসা আমার বড় ভাই মহেশ চন্দ্র দেবনাথ, (তঁারই আপন ছোটভাই) স্কুল মাঠে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর পাহারারত মুক্তিযোদ্ধা ধনঞ্জয় দেবনাথ কে দেখতে পেয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর কুশল বিনিময়ের ফাঁকে তার কাছে থাকা ভারী অস্ত্রটি কিভাবে চালায় তা জানতে চায়। এরই মধ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি (আমার বড় ভাই) তাঁর অস্ত্রের গায়ে হাত বুলাতে থাকেন। এক পর্যায়ে অটো ট্রিগারে চাপ পড়ার সাথে সাথে ৩/৪ বুলেট তার বুকে বিদ্ধ হয়ে সাথে সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অস্ত্রের শব্দ শুনে আমরা যে অবস্থায় আছি সে অবস্থা থেকে ঘটনা স্থলে ছুটে আসি এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করি। তখন ভারতীয় মিত্র বাহিনীর লোকেরা এসে তদন্ত করে ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা বলে সাব্যস্ত করেন এবং এ ঘটনাটি হাজার হাজার লোকের সামনে হওয়ায় তাঁকে শহিদ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন, যা আর পরবর্তীতে করা হয়নি। আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভঙ্গুর মন নিয়ে পরবর্তী আরো কয়েকদিন আমরা ক্যাম্পে থাকার পর ভারতীয় মিত্রবাহিনীর মেজর গুরবাহান সিং ও তার দল আমাদের কাছ থেকে রক্ষিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সব নিয়ে আমাদেরকে যার যার গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তখন আমরা যার যার বাড়ি চলে আসি।



বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া

৬৯ এর ছাত্রনেতা,

যুদ্ধকালীন কমান্ডার কালিগঞ্জ, গাজীপুর

১৯৪৭ সনে ব্রিটিশ রাজত্বের যবনিকা পতনের পর ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র কি ভাবে গঠিত হয়। পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটিকে দুভাগে বিভক্ত করে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধানে দুটি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমরা বাঙালিরা জনসংখ্যায় বেশি হলেও দেশের রাজধানী এখানে না করে রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানি বর্বর শাসক গোষ্ঠী সেখানে বসে আমাদের এ দেশকে শোষণ করার জন্য ষড়যন্ত্রের নীলনক্সা তৈরি শুরু করে। শুরুতেই তারা হাত দেয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার উপর। ১৯৫২ সনে ঢাকায় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী উদ্যোক্তা প্রনোদিতভাবে তাদের কুৎসিত মনোভাব পুরন করতে এদেশের মানুষের মাতৃভাষা “বাংলা” হওয়া সত্ত্বেও উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে আমাদের বাঙালিদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। এ ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে এদেশের ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফেটে পরে এবং প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। আমাদের মায়ের ভাষা “বাংলা ভাষা” প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজপথে মিছিল ও কঠোর আন্দোলন করতে হয়। আন্দোলন বন্ধ করতে বাঙালিদের উপর নির্মমভাবে গুলি করা হয়। বাঙালি জাতি বীরের জাতি মাথা নোয়াবার নয়। গুলিতে রক্তাক্ত হলো ঢাকার রাজপথ। রফিক, জব্বার, বরকতসহ অনেকেই শাহাদৎ বরণ করেন। যারা শাহাদত বরণ করেন তাঁরা আজ “শহিদ”। তাঁদের সম্মানে সারা দেশে নির্মিত হয় শহিদ মিনার। আমরা বাঙালিজাতি প্রতি বছর শহিদদের স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারী যথাযথ শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে “শহিদ দিবস” পালন করে থাকি। আমাদের বাংলা ভাষা “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা” হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন আমরা শহিদ দিবসের সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসও উৎযাপন করে থাকি। বর্বর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ‘ভাষা’ নিয়ে তাদের কুচক্রী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চরমভাবে

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যর্থ হওয়ার পর হতে পরাজয়ের গ্লানিতে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাবসা বাণিজ্যে সমান সুযোগ না দিয়ে বাঙালিদেরকে দাবিয়ে রাখাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সশস্ত্র বাহিনীতে, সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে উঁচু পর্যায়ের পদমর্যাদায় এমনকি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় বাঙালিদের সুযোগ দেওয়া হতো না। শোষণের যাতাকলে বাঙালিদেরকে চরমভাবে নিষ্পেষিত করা হতো। সব সুযোগ দেওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ তথা তাদের নিজেদের লোকদেরকে। হীনমন্যতায় বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি করাই ছিল তাদের জঘন্য কুৎসিত মানষিকতা। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির হীন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের স্বীকার হয়ে তাদের বিরুদ্ধে এদেশের সাহসী দেশপ্রেমিক অনেক সুখ্যাতি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে লড়তে হয়েছে বহুবার। কখনো কখনো কিছুটা সফলতা আসলেও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে অনেককে চরম নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছে কারাবরণও করতে হয়েছে। এমন কি জীবনও দিতে হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে সবসময়।

১৯৬৬ সনে আমাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবী উত্থাপন করেন। জনমত তৈরি করতে সভা সমাবেশ মিছিলসহ রাজনৈতিক সকল প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" এ শিরোনামে পোষ্টার ছাপিয়ে জনমত সৃষ্টির জন্য সারা দেশের জনগণের মাঝে পৌঁছানো হয়। জনগণ বুঝতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পেরেন। বিক্ষোভ মিছিল আন্দোলনে রাজনৈতিক মাঠ হয়ে উঠে চরম উত্তপ্ত। এ অবস্থা দেখে পাকিস্তানি বর্বর শাসক গোষ্ঠির অন্তরজ্বালায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছিল। তখন ঢাকাস্থ ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু ভাই (সাবেক মাননীয় মন্ত্রী) আমাদের ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন। ৬ দফা দাবী আদায়ের ভিত্তিতে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কর্মসূচি পালন করা হয়। আমি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হয়ে এবং ছাত্রলীগের মূলনীতি শিক্ষা শান্তি প্রগতি এর উপর আস্থাশীল ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগে যোগদান করি। ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে বিভিন্ন আন্দোলনে কর্মসূচিতে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে সক্রিয় ভূমিকা রাখি। কখনো কখনো কোন সমস্যা হলে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান স্যারের কাছে যাওয়া হতো। স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনেক

মূল্যবান কিছু কথা জানার সুযোগ হতো। স্যার ছিলেন খুবই অমায়িক ও রসিক মানুষ। এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ শাখার কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত ছাত্রলীগের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ শাখার কমিটি নির্বাচিত করে কমিটি গঠন করা হয়। এ নুতন কমিটিতে আমার স্কুল জীবনের বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা কেবিএম মফিজুর রহমান খানকে সভাপতি এবং আমাকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এরপর হতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে ও সংগঠনের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় থাকি। কোন কোন সময় সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে আমাকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হতো। ঐ সময় ইকবাল হল বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। সন্ধ্যার পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনেকেই সেখানে একত্রিত হতেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ছাত্রলীগের বহু নেতা কর্মীগণও সেখানে আসতেন। সুযোগ পেলেই আমিও সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। সেখানে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হতো। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কাজ করার সুযোগ হতো, অনেকের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা যাঁদের নাম এখন স্মরণ হচ্ছে তাঁরা হলেনঃ সর্বশ্রদ্ধেয় জনাব সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক (সাবেক মন্ত্রী), মাজহারুল হক বাকী, আব্দুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, নুরে আলম সিদ্দিকী, তোফায়েল আহমেদ (বর্তমানে মাননীয় মন্ত্রী), আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আ.স.ম. আব্দুর রব (পরবর্তিতে দল পরিবর্তন করেন ও সাবেক মন্ত্রী), শাহজাহান সিরাজ (পরবর্তিতে দল পরিবর্তন করেন ও সাবেক মাননীয় মন্ত্রী), শেখ শহীদুল ইসলাম (পরবর্তিতে দল পরিবর্তন করেন ও সাবেক মাননীয় মন্ত্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে বন্যা বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতার জন্য এলাকায় গিয়ে আমরা ছাত্রলীগের মাধ্যমে সম্ভাব্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বিভিন্ন কারণে জগন্নাথ কলেজ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পরে। সলিমুল্লাহ ডিগ্রী কলেজে বর্তমানে সলিমুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতক বাণিজ্য শ্রেণিতে ভর্তি হই। এখানে অধ্যয়নকালে পরিলক্ষিত হলো ছাত্রদের কোন সমস্যা দেখার জন্য কোন ছাত্র সংগঠন নেই। এমনকি ছাত্র প্রতিনিধিও নেই। কেন্দ্রের সাথে পরামর্শ করে আমরা ছাত্রলীগের কর্মীরা মিলে কলেজে ছাত্রলীগ শাখা গঠন করি। এরপর ছাত্র ইউনিয়নের শাখাও গঠিত হয়।

ছাত্রলীগের প্রথম সভায় আমাকে কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি নির্বাচিত করে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠিত হয়। সাংগঠনিক নানারকম সমস্যা নিয়ে কাজ করতে থাকি। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্র সংসদ গঠনের জন্য দাবী করি। বহুবার অনুরোধ করার পরও কর্তৃপক্ষ নানা তালবাহানায় ছাত্রসংসদ নির্বাচন দিতে গড়িমসি করতে থাকেন। একপর্যায়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন আদায়ের জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করি। সে সময়ে কলেজের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল মিয়া মোহাম্মদ হামিদ স্যার। তিনি আমাদেরকে বেশ সহযোগিতা করেন। তিনি একজন পরহেজগার খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। অতঃপর আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ একপর্যায়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনের তারিখ ও তফসিল ঘোষণা করা হলো। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়ে গেল। ছাত্রলীগের পুরো প্যানেল বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করলো। আমি ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হলাম। কলেজের প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের পুরো প্যানেল বিপুল ভোটে জয়লাভ করায় কলেজ ও এলাকায় যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তাছাড়া মানুষের ভালোবাসা কেমন হতে পারে এ নিয়ে একটি ছোট্ট ঘটনা বলতে হয়। আমাদের কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরে গুলিস্তানে অবস্থিত তৎকালীন বঙ্গবাজার হকার মার্কেট হতে একদল ব্যবসায়ী টিপু সুলতান রোডে অবস্থিত আমাদের কলেজ কম্পাউন্ডে এসে আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে তাঁরা আমাকে তাদের মাথার উপরে উঠিয়ে পুরা নবাবপুর রোড দিয়ে মিছিল করে তাঁদের হকার মার্কেটে নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত অনেক ব্যবসায়ী আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। সবাই জয়ধ্বনি করে শ্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁরা আমাকে আবার তাদের মাথায় উঠিয়ে নবাবপুর রোড দিয়ে মিছিল করে কলেজে পৌঁছে দেন। লোকজন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দৃশ্য অবলোকন করেন। স্মৃতিটি মনে হলে চিন্তা করি হৃদয়ে কেমন ভালোবাসা থাকলে এভাবে পাগলের মত ঘটনা ঘটাতে পারে। তারা আমাকে তাদের মার্কেটের উপদেষ্টা বানিয়ে ছিলেন। আমি কেবল তাদের জন্য কিছু পরামর্শ আর কিছু সময় দিয়েছিলাম মাত্র। এর প্রতিদান তারা যেভাবে প্রদর্শন করেছেন তা আমার স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাজের পরিধি ও দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ি। শহিদ দিবস পালনের জন্য

কলেজ ছাত্রলীগ শাখা হতে কর্মসূচি গ্রহণ করি। শহিদ দিবস পালন উপলক্ষে সলিমুল্লাহ কলেজ ছাত্রলীগ শাখার পক্ষ হতে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদি ও সমালোচনামূলক লেখা দিয়ে স্বরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। স্বরণিকার নামকরণ করা হয় “রক্ত স্বাক্ষর”। স্বরণিকা প্রকাশের গুরুদায়িত্ব আমার মাথায় নিয়ে লেখা সংগ্রহ করে জিন্দাবাজারের এক থ্রেসে ছাপাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় স্বরণিকা ডেলিভারি দেওয়ার কথা। কিন্তু আমাদেরকে দুপুরের আগে প্রফ দেখে দিতে হবে। জরুরিভাবে ছাপাখানায় যাওয়া দরকার। তখন ঢাকা শহরে সামরিক সরকারের কারফিউ চলছে। তথাপিও সকালে নাস্তা খেয়ে মালিটোলোর বাসা হতে জিন্দাবাজার ছাপাখানায় যাওয়ার পথে রওয়ানা হলাম। তাঁতিবাজার মোড়ে পৌঁছা মাত্রই পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর সাজোয়া গাড়ী আমার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়। কারফিউর সময় কাউকে রাস্তায় পাওয়া গেলে গুলি করার নিয়ম থাকলেও তারা গুলি না করে ২/৩ জন সৈন্য গাড়ী হতে দ্রুত নেমে আমাকে আটক করে ফেলে। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই খুবই রাগান্বিত হয়ে আমার গায়ের উপর রুট দিয়ে লাথি মারতে থাকে ও রাইফেলের বাট দিয়ে নির্যাতনের একপর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে তারা আমাকে রাস্তায় ফেলে চলে যায়। সৈন্যদের গাড়ী চলে যাওয়ার পর স্থানীয় কিছু লোকজন আমাকে সাথে সাথে উঠিয়ে তাদের মধ্যে একজনের বাসায় নিয়ে গেলেন। তাদের যথেষ্ট সেবা যত্নে কিছুটা সুস্থ অনুভব করতে লাগলাম। পরে উঠে দাড়িলাম। তখন শরীর খুবই কাহিল। আস্তে আস্তে খুব সাবধানতার সাথে ছাপাখানায় যাওয়ার জন্য আবার হাটা শুরু করলাম। ছাপাখানায় পৌঁছার পরই আমার একজন সহকর্মী যিনি সকালেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। তাকে সব কথা খুলে বললাম। যাহোক আমরা দুজনে প্রফ দেখে দিলাম। ছাপাখানার লোকজনও আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। ছাপার কাজ শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাইন্ডিংসহ সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পর স্বরণিকাগুলো বুঝে নিয়ে আমরা দুজনে মিলে রাত প্রায় দশটায় রিকশায় স্বরণিকাগুলো উঠিয়ে আমাদের কলেজে রওয়ানা হলাম। জগন্নাথ কলেজের পূর্ব গেইটের নিকট পৌঁছতেই দেখি রাস্তার অপর পাড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাজোয়া গাড়ী। ভয় পেয়ে গেলাম এবার ধরা পরলে আর হয়তো রক্ষা নেই। আমরা দ্রুতগতিতে স্বরণিকাগুলো কলেজ গেইটের উপর দিয়ে বাউভারীর ভিতরে ছুড়ে ফেলে সরে পড়ি। বেশ কিছুক্ষণ পর গাড়ী চলে গেলে স্বরণিকাগুলো রিকশায় উঠিয়ে নিয়ে আমাদের কলেজে গিয়ে পৌঁছি। পরদিন ২১

ফেব্রুয়ারী ভোর হতেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে রাস্তায় প্রভাত ফেরী বের হয়। আমরাও প্রভাত ফেরীতে যোগ দিয়ে শহিদ মিনারে যাই। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে শহিদমিনারে পুষ্প স্তবক অর্পন করি। তৎকালীন সময়ে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে স্বরগিকা প্রকাশ করে শহিদ মিনার প্রাঙ্গনে নিয়ে লোকজনের মধ্যে বিতরন করার নিয়ম প্রচলন ছিল। আমরা আমাদের স্বরগিকা "রক্ত স্বাক্ষর" শহিদ মিনার এলাকায় উপস্থিত অনেকের হাতে তুলে দেই। আমাদের স্বরগিকা "রক্ত স্বাক্ষর" অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেখে খুব আনন্দ লাগছিল। অতঃপর যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আমরা সেখান থেকে নিজ নিজ বাসায় সবাই চলে যাই। পরবর্তি একসময় আমরা কয়েকজন ছাত্রবন্ধু মিলে স্থির করলাম আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে পুরানা পল্টন আওয়ামী অফিসে সন্ধ্যার পর যাব। সন্ধ্যায় সেখানে যাওয়ার পর ভাগ্যক্রমে নেতার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটল। আমরা খুবই পুলকিত হলাম। সালাম দিয়ে কদমবুসি ও করমর্দন করলাম। এরপর প্রায়শই সেখানে যাওয়া হতো। আওয়ামীলীগ অফিসে গেলেই বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষায় থাকতাম। তিনি অফিস হতে চলে যাওয়ার সময় দোতারা হতে সিঁড়ি দিয়ে হেটে আস্তে আস্তে নিচে নামার সময় তাঁর সাথে থাকার সুযোগ হতো। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনি কারো না কারো কাঁধের উপর হাত রেখে কথা বলতে বলতে নিচে নামতেন। বঙ্গবন্ধুর পরশমাখা হাত আমার কাঁধেও রাখায় সৌভাগ্য হয় অনেকবার যা মনে হলে এখনো পুলকিত হই। এ স্মৃতি কখনো ভোলা যায় না। এ স্মৃতি চির অম্লান। আমাদের মধ্যে মহান আল্লাহপাকের রহমত ছিল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আর সততা সাহস ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়েছি। ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশকে ভালবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। ব্যক্তিগত কোন চাওয়া ছিল না। নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে কাজ করেছি। এটাই ছিল আমাদের বড় সম্ভ্রুতি। এখনো সেখানেই স্থির আছি। মহান আল্লাহপাকের পথে থেকে দেশের জন্য মানুষের জন্য কাজ করতে পারলেই জীবন সার্থক মনে করি।

গণঅভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিতকরণ:

বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবী আদায় ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে সারা দেশব্যাপী শুরু হয় ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ১৯৬৮ সনের শেষের দিকে ছাত্র অসন্তোষ এবং তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসক

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবীতে সারা দেশের জনসাধারণ রাস্তায় নেমে আসেন। আন্দোলন আরো প্রবল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সনে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে খুবই জোরালো প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে মিছিল, হরতাল, প্রতিরোধ, ঘেরাও চলতে থাকে। তখন ছাত্র সমাজের যুগোপযোগী শক্তিশালী ভূমিকা অনিবার্য হয়ে পরে।

১৯৬৯ সনের ৪ জানুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ছাত্রদের সমস্যার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ এবং সময়োপযোগী দাবীদাওয়া অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে ১১ দফা দাবী প্রণয়ন করা হয়। ১১ দফা ও ৬ দফা দাবীকে কেন্দ্র করে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে। উল্লেখ্য যে, পূর্ব থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবী নিয়ে রাজনীতির মাঠ যেভাবে আন্দোলনে মুখরিত ছিল তা আরো প্রাধান্য হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় সারা দেশের আপামর ছাত্র জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ২০ জানুয়ারী শহিদ আসাদ, ২৪ তারিখে শহিদ মতিউর, ১৫ ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবং ১৮ তারিখে ড. সামসুজ্জোহাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎবেগে গর্জে উঠেন এ অবস্থায় আন্দোলন আরো কঠোর ও উত্তপ্ত হয়ে “গণঅভ্যুত্থানে” রূপ নেয়। অতঃপর ২২ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইউব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুসহ উক্ত মামলার আসামীগণকে বিশাল গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মুখপাত্র তৎকালীন বিপ্লবী ছাত্রনেতা ডাকসুর ভিপি জনাব তোফায়েল আহমেদ (সাবেক মাননীয় মন্ত্রী) ছাত্র জনতার পক্ষ হতে বাংলার মানুষের নয়নমনি প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে সারা এলাকা করতালি আর স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। পরবর্তিতে আওয়ামীলীগসহ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতির মাঠ উত্তাপ রাখার চিন্তাভাবনা নিয়ে দলীয় কর্মকাণ্ড শুরু করে। সারা দেশ আন্দোলনে মুখর হলেও ঢাকা শহর মিছিল ও আন্দোলনের নগরীতে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধু পুরান ঢাকার ইসলামপুর নবাবপুরসহ ঢাকা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জনগণের সাথে কুশল বিনিময় ও বিশাল জনসমাবেশে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতেন। আমরা ছাত্রলীগের কর্মীরাও বঙ্গবন্ধুর সভায় হাজির থাকতাম। একদিন নবাবপুর রোডের উত্তর প্রান্তে পূর্বে থাকা রেললাইনের

দক্ষিণ সংলগ্ন মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট ছিল, এর সামনে এক জনসভায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। সেদিন মঞ্চে আমাকে দুটো কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। এটা আমার জীবনে এক পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। তৎকালীন সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে নেতা কর্মীদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও আদর্শই ছিল প্রধান। আমরা ছাত্রলীগের কর্মী এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসাবে চাওয়া পাওয়ার যেমনি কোন চিন্তাভাবনাই মাথায় ছিলনা, তেমনি আত্ম সম্মানের জায়গায় নাই কোন আপোষ।

সারা দেশে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সনের ২৪ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের লৌহমানব বলে কথিত আউয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে আইয়ুব খান যুগের যবনিকা পতন ঘটে। এবারও স্বৈরশাসক তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেই সামরিক আইন জারী করেন। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিল জনগণ এটাকে সহজভাবে মেনে নেবেন না। তাছাড়া রাজনৈতিক চাপও ছিল যথেষ্ট। এমন অবস্থায় কৌশলে নিজেকে দায়মুক্ত রাখার জন্য ১৯৭০ সনে ইয়াহিয়া খান জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করেন। তবে গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৭০ সনের নির্বাচন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশে নির্বাচনি হাওয়া জোরোসোরে বহিতে শুরু করলো। এমনি এক সময়ে কালীগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট সবুর আশরাফি ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি ঢাকায় থাকতেন। তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি আমাকে জানালেন আসন্ন নির্বাচনে আমাদের কালীগঞ্জ এলাকা হতে ময়েজউদ্দিন ভাই আওয়ামীলীগের নমিনেশন পাচ্ছেন। তখন জনাব ময়েজ উদ্দিন ভাইয়ের সাথে পরিচয় ছিল না। একদিন আমার স্কুল জীবনের বন্ধু তাছাড়া আত্মীয়ও বটে জনাব আজগর রশিদ খানসহ আমরা দুজনে একত্রে মিলিত হয়ে ময়েজউদ্দিন ভাইয়ের সাথে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে কমলাপুরের মুগদাতে তাঁর বাসায় যাই। তিনি বাসায় না থাকায় ঐদিন দেখা হয় নি। পরবর্তিতে অবশ্য দেখা হয়ে পরিচয় হয়। এরপর অনেকবারই সাক্ষাৎ হয় সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ গড়ে উঠে। এরইমধ্যে কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক সফরে তিনি আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অনেকেই বিভিন্ন সময়ে সফর সঙ্গী হিসাবে থাকতেন। পরবর্তিতে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হতে প্রার্থীগণের নাম চূড়ান্ত ঘোষণা হলো। আমি ছাত্ররাজনীতিতে ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে ঢাকা মহানগর

ছাত্রলীগের সহসভাপতি ঢাকা সলিমুল্লাহ কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত ভিপি ও কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঢাকা নগরীতেই ব্যস্ত থাকলেও ভাবলাম নির্বাচনের সময় নিজ এলাকার জনগণের সাথে থেকে কাজ করবো এর চেয়ে আনন্দ কি হতে পারে। এটাকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কাজে যুক্ত হয়ে কর্তব্য পালনের জন্য ঢাকা হতে কালীগঞ্জ চলে আসি। ঘোড়াশালের জনাব কাজী আনিসুর রহমান ভাইকে কালীগঞ্জ এলাকায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রদ্ধেয় জনাব তাজ উদ্দিন আহমেদ ও জনাব ময়েজ উদ্দিন ভাই এই দুই নেতার সাথে একীভূত হয়ে দিন রাত নিরলসভাবে অবিরাম কাজ করার সুযোগ হয়। এতে কষ্ট হলেও আনন্দ ছিল প্রচুর। এমন দুজন নেতার সাথে থেকে পুরো কালীগঞ্জ থানার সকল এলাকায় পায়ে হেটে হেটে ভোটদারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চেয়েছি, নির্বাচনি এলাকায় প্রচারণার জন্য মিছিল মিটিং করেছি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে জনগণকে সংগঠিত করেছি। জনগণের নিকট গিয়ে ভোট চাওয়ায় তাঁরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সারা দেন। নির্বাচনী প্রচার কাজ পরিচালনায় উভয় নেতার খুবই ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন হতে পেরেছি। আমার সততা ও নিষ্ঠা নেতাদেরকে মুগ্ধ করেছে বুঝতে পেরে খুবই আনন্দ পাই, এটাইতো তৃপ্তি। নির্বাচনি প্রচারনা কাজে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহাব উদ্দিন (ময়েজ উদ্দিন ভাইয়ের সহোদর ছোট ভাই) এর সাথে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই হয়তো আমরা দুজনে অনেক দুরূহ কাজে জীবনের অনেক ঝুঁকি নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত একত্রে থেকেছি। মনে পড়ে একদিন কালীগঞ্জ হতে নির্বাচনী কাজ শেষে মধ্যরাতে ট্রেনে কমলাপুর পৌছার পর রিকশায় বাসায় ফেরার পথে আরামবাগ কলোনির নিকট ৫/৬ জন অপরিচিত মাস্তান টাইপের লোক রিকশা থামায়। তারা আমার শরীর তল্লাশী করে টাকাপয়সা তেমন কিছু না পেয়ে খুবই হিংস্র ভাষায় গালিগালাজ করে এবং মেঝে ফেলার হুমকিও দেয়। সত্যিকথা সেদিন খুব ভয়ই পেয়েছিলাম বটে। বন্ধু শাহাব উদ্দিন ঐদিন সাথে ছিল না। তখন মনে মনে আল্লাহপাকের সাহায্যের জন্য আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। এরই মধ্যে ওদের মধ্য হতে দুজন আমাকে ছেড়ে দিতে বললে বাকিরা কোন উচ্চ বাচ্য না করে রাস্তার ফুটপাথে উপর চলে আসে। ইত্যবসরে দ্রুত রিকশায় বাসায় চলে এসে দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে মহান আল্লাহতায়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করি।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্য ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক

পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮ আসনে জয়লাভ করে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করলেও আওয়ামীলীগ নিরংকুশ বিজয় লাভ করার পরও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নানা তালবাহানা করতে থাকে। এর প্রতিবাদে এ বাংলার ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জনতা সকল স্তরের চাকুরীজীবী পেশাজীবীগণ সাধারণ মানুষ সবাই বিক্ষোভে গর্জে উঠেন। মানুষ যাতে রাস্তায় বের হতে না পারে সেজন্য ইয়াহিয়া খান মানুষকে আবদ্ধ করে রাখতে কারফিউ জারী করলো। সাধারণ মানুষের উপর গুলি করার হুকুম দিল। বহু লোককে হত্যা করা হলো। তথাপিও গুলির ভয় তোয়াক্কা না করে ছাত্র জনতা মিলে অপারিসীম সাহসিকতা নিয়ে মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলো। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর জনসভায় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে জনসভা আহ্বান করেন। ঐদিন সকাল হতেই আসা শুরু হয় মানুষের অগণিত মিছিল। দুপুরের আগেই মিছিল আর মিছিলে জনতার ঢল নামে। তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সৃষ্টি হয় বিশাল জনসমুদ্রে। কোথাও তিল ধারণের জায়গা ঠাই নেই। সবার হাতে ছিল বাঁশের লাঠি আর মুখে ছিল স্লোগান। ঐসময় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হতে মগবাজার এলাকার আহবায়ক হিসাবে আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত ছিল। আমাদের অফিস ছিল মগবাজারস্থ পেয়ারাবাগে অফিসের সামনে বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত লাল সবুজের এক বিশাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে প্রতিনিয়ত এলাকার ছাত্র যুবক সাধারণ লোকজন একত্রিত হলে আলোচনা চলতো এবং সময়োপযোগী কর্মসূচিও গ্রহণ করা হতো। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের বঙ্গবন্ধুর জনসভায় যাওয়ার ব্যাপারে লোকজনকে সংগঠিত করে ছাত্র জনতার বিশাল মিছিল নিয়ে রাজপথ স্লোগানে মুখরিত করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদান করে মঞ্চের সামনে অবস্থান নেই। আমাদের সবার হাতে ছিল বাঁশের লাঠি।

বিকেল ৩ টা ২০ মিনিট দশ লাখ লোকের অভূতপূর্ব বিশাল জনসমাবেশে গর্জে উঠল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃকণ্ঠ। ২৩ বছর বাঙালি জাতির উপর পাকিস্তানি বর্বর শাসক গোষ্ঠীর শোষণ বঞ্চনা আর তাদের চক্রান্তের ইতিহাস হৃদয়ের ভিতরে যা ধারণ করেছিলেন তা সবকিছু উজার করে জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃকণ্ঠে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন। “বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের অধিকার চাই। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, একবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।” এ ভাষণ ছিল স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে দুঃসাহসিক ঐতিহাসিক ঘোষণা। যুদ্ধ করেই স্বাধীনতা অর্জন করবো এ নীতি অবলম্বনে যুদ্ধের জন্য কি কি প্রস্তুতি নিতে হবে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে পরিষ্কারভাবে নির্দেশনা দিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ঘোষণার পর ছাত্র-জনতা মিলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের সকল এলাকায় স্থানীয়ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ঢাকাতে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রতিদিন বিকালে ডেমি রাইফেল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। আমরা মগবাজার হতে নিয়মিত সেখানে যেতাম। অধিকন্তু স্থানীয়ভাবে মগবাজার এলাকাতেও পেয়ারাবাগের এক মাঠে (বর্তমানে পুবালা ব্যংক অফিসার্স কোয়ার্টার হাউজিং কমপ্লেক্স) প্রতিদিন সকালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। প্রশিক্ষণ শেষে সবার জন্য হালকা নাস্তারও ব্যবস্থা করি। আমার এক বন্ধু সাবেক সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে উপস্থিত সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করা হয়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়। ঢাকা শহরে ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া অন্য কোন এলাকাতেই পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত লাল সবুজের পতাকা উড়ানো হয়। আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রাক মিছিল করি, এবং কবি নজরুলের বিদ্রোহী গানগুলো পরিবেশনের মাধ্যমে সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করি। ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ঐসময় ইয়াহিয়া খান তার দলবল নিয়ে অবস্থান করছিল। ঐ হোটেলের সামনে ট্রাক থামিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন

করা হয়। পাকিস্তান বিরোধী আমাদের স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ১৫ মার্চ অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসলেন। ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে ১৬ মার্চ হতে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া শীর্ষ বৈঠক চলে। বৈঠকে ইয়াহিয়া খান তাদের কুচক্রী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনায় সমাধানের পথে না গিয়ে বরং আলোচনার নামে কাল ক্ষেপণ করতে থাকেন এবং হিংস্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পশ্চিম পাকিস্তান হতে শীপে করে যুদ্ধাস্ত্র এবং সৈন্য আনতে থাকে এদেশে। এ খবর প্রকাশ হয়ে যায়। অগত্যা ২৫ মার্চ তারিখ দিবাগত রাতে এদেশের মনুষ্যকে অর্থাৎ বাঙালিদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যা করার জন্য সেনাবাহিনীকে হুকুম দিয়ে ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টো ও অন্যান্যদেরকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে নিজের কপালে কলংক লেপন করে চোরের মত পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যায়।

২৫ মার্চ নিজস্ব মনের তাগিদে রাত প্রায় দশটার দিকে আমরা ছাত্রলীগের স্থানীয় ১০/১২ জন বন্ধু মিলে মগবাজার হতে বাইসাইকেলে চড়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে যাই। আন্দলনে সংগ্রামে এর আগেও অনেক বার গিয়েছি দেখা করেছি। ঐদিন বঙ্গবন্ধুর বৈঠকখানায় দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দেরকে নিয়ে চলছিল বঙ্গবন্ধুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। শীর্ষ ছাত্র নেতৃবৃন্দও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অবস্থা দেখে মনে হলো আজ দেখা করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বৈঠকখানার বাইরে তৎকালীন ছাত্রনেতা পরবর্তীতে ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম শহীদ ভাই, জাতীয় শ্রমিকলীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান ও আরো কয়েকজন নেতৃবৃন্দকে দেখতে পাই। তখন শহীদ ভাই আমাকে ডেকে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি কিছু ব্রিফিং দিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং আরো কিছু পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে চলে যেতে বললেন। আমরা বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক মগবাজার এলাকায় চলে এসে আমাদের নেতা কর্মী আরো যারা অপেক্ষায় ছিলেন তাদেরকে নিয়ে শহীদ ভাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী সম্ভাব্য কাজগুলো সম্পাদনের ব্যবস্থা করে সবার বাসা কাছাকাছি থাকায় রাত বারোটার কিছু আগেই যার যার বাসায় চলে যাওয়ার জন্য বিদায় নেই। বাসায় সবাই ঠিকমত পৌছতে পেরেছে কিনা জানিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ করে শুনতে পেলাম অনবরত গুলির আওয়াজ, রাস্তায় ট্যাংক চলার বিকট শব্দ। ঐসময় রাস্তায় আর কিছুক্ষণ দেরি হলেই বর্বর হানাদার বাহিনীর সামনে পরতে হতো। আর তারা আমাদেরকে পেলে বাঁচার কোন

উপায় ছিল না। মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে বেঁচে গেলাম।

২৬ মার্চ সামরিক জাস্তা কারফিউ জারী করলো। ঢাকা শহরের সব রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ীতে করে হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা অনবরত টহল দিতে লাগলো। কারফিউর মধ্যে কোন লোককে রাস্তায় বের হতে দেয়নি। বুঝতে আর বাকি রইলো না পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। নিমিষেই দেখা গেল মালিবাগ এলাকায় আগুনের ফুলকি, চারিদিকে চোখ বালসানো আলো। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট টার্গেট শুরুতেই রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ব্যারাক পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং পুলিশ বাহিনীর উপর গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করা হলো।

২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার পর পরই বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশের দামাল সন্তানরা নিজেদের প্রিয় জীবন উৎসর্গ করে পাকিস্তানি সামরিক জাস্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষও সে সময় যে যেভাবে পারে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিজেদেরকে উজার করে দিয়েছিলেন, যা কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় জানা মতে ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষকে শুধু আশ্রয়ই দেয়নি বরং এদেশের দামাল সন্তানেরা যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধ করে হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে সেজন্য মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। এজন্য আমরা ভারত সরকারের মহানুভবতার জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭১ এর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর ইয়াহিয়া খানের গাওঁদাহ শুরু হয়। পরাজয়ের গ্লানি সহিতে না পেয়ে তার হুকুমে বর্বর দখলদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হেফতার করে। হেফতারের বিরুদ্ধে মানুষ যাতে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে না পারে সেজন্য তারা কারফিউ দিয়ে ঢাকা শহর অবরুদ্ধ করে রাখে। ২৭ মার্চ সকালে অল্প সময়ের জন্য কার্ফিও শিথিল করা হলেও হানাদার বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে রাস্তায় অনবরত টহল দিতে দেখা যায়। এসময় জনগণ ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং নিদারুণ অবস্থায় শহর ছেড়ে যার যার গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য রাস্তাজুড়ে নামে মানুষের ঢল। কালবিলম্ব না করে

আমিও আমাদের নেতা সংসদ সদস্য ময়েজউদ্দিন ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাঁকে না পেয়ে চলে গেলাম শীতলক্ষ্যা নদীর ডেমরা লঞ্চঘাট। সেখান থেকে লঞ্চ করে নিজ এলাকা কালীগঞ্জ চলে যাই। কালীগঞ্জ থানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প থাকায় পলাশ চলে যাই। তৎকালীন সময়ে পলাশ কালীগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পলাশ একটি শিল্পাঞ্চল এলাকা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ‘৬৯ এর ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগের একজন ছোটখাটো নেতা বা কর্মী হিসাবে আমার সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখে এবং স্থানীয় লোক হিসাবে আমাকে বেছে নেন আমাদের প্রিয় সাবেক মন্ত্রী মরহুম রাজ্জাক ভাই, সাবেক মন্ত্রী জনাব তোফায়েল ভাই ও শ্রমিকলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল মান্নান ভাই। কালীগঞ্জ এলাকার খলাপাড়া পলাশ ও রূপগঞ্জের কাঞ্চন শিল্প এলাকার জুট মিলে গিয়ে স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের সাথে সমন্বয় করে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে পাঠানো হয়। ঐসময় শ্রমিকদের মধ্যে মাঝেমধ্যে গুরুতর ঝগড়াঝাটি মারমারি এমনকি অগ্নিসংযোগের মত ঘটনাও ঘটত। শ্রমিক সংগঠন নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকলেও নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে আমাকে বিভিন্ন সময় যখন অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো তখনই সেখানে গিয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। আল্লাহর রহমতে স্থানীয় সকলের সহযোগিতা নিয়ে অনেকটা সফলভাবে কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। সে সুবাদে অনেকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছোট করে বলতে গেলে খলাপাড়া জুটমিল এলাকায় বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ, পলাশের স্থানীয় বীরমুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত ফজলুল হক মুধা, বীরমুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান সিরাজ (বর্তমানে আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রম সম্পাদক), ঘোড়াশাল এলাকার শ্রমিকনেতা প্রয়াত আব্দুর রহমান (পরবর্তিকালে শ্রমিকলীগের সভাপতি) ছাড়াও আরো অনেকের সহযোগিতা ছিল।

তারপর আগরতলায় প্রশিক্ষণে যাওয়ার জন্য কালীগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে লোকজনকে সংগঠিত করে আবার পলাশ চলে আসি। ঐ সময় পলাশ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জনাব আব্দুল আউয়াল সাহেব। তার সাথে দেখা হলে তিনি সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তার সাথে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাকে বড় ভাইয়ের মত মনে করতাম। নির্বাচনের সময় তিনি আমাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় যান এবং নির্বাচনী সভায় বক্তব্যও রাখেন। তিনি একজন সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। জানতে পারলাম তৎকালীন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান পরবর্তিতে মেজর জেনারেল শীতলক্ষ্যা

নদীর পূর্ব পাড়ে ডাঙা নামক এলাকায় অবস্থান করছেন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা হিসাবে তার সাথে দেখা করা প্রয়োজন মনে করি। অতঃপর সেখানে যাওয়ার জন্য প্রিন্সিপ্যাল আউয়াল ভাই একটি স্পীডবোর্ড যোগাড় করলেন। তা নিয়ে আমরা কয়েকজন মিলে ডাঙায় গিয়ে ক্যাপ্টেন মতিউরের সাথে দেখা করি। তিনি আমাদের সকলের সাথে পরিচিত হওয়ার পর কিছু পরামর্শ দিলেন। সেখান থেকে এসে কোন পথে আগরতলা যাওয়া ঝুঁকি কম তা খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। লোকজনকে প্রশিক্ষণের জন্য আগরতলায় পাঠানোর প্রচেষ্টা চালাই। এর মধ্যে মনোহরদী হাতীরদিয়াসহ অন্যান্য এলাকার কিছু লোকজন পলাশ এসে আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আগরতলায় যাবেন। বিভিন্ন এলাকার যুবকেরা পর্যায়ক্রমে আগরতলায় যায়।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি এবং আনুষঙ্গিক ঘটনা প্রবাহ :

মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যারা বিভিন্ন পথে ভারতে গিয়েছেন তাদের যাত্রা পথ ছিল কতইনা দুর্গম আর ঝুঁকিপূর্ণ বলতে গেলে সারাটা পথেই ছিল জীবন-মরণ এর মুখোমুখি। কোথায় থাকবে কোথায় থাকবে কোন চিন্তাই ছিল না। দেশ কবে স্বাধীন হবে তাও ছিল অনিশ্চিত। সর্বোপরি বেঁচে থাকবে কিনা এ নিয়েও তাদের কোন চিন্তা ছিলনা। তাঁদের চরম ত্যাগের কথা আজ কতজন উপলব্ধি করছেন জানি না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্তমান গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীনে ছিল পলাশ শিল্পাঞ্চল। ঢাকা হতে গিয়ে পলাশে থেকেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শুরু করি। বাড়ীতে কাউকে না বলেই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পলাশ থেকে যাত্রা শুরু হয়। ডাঙ্গা হয়ে পাঁচদোনার নিকট পৌঁছার পর জানতে পারলাম মুক্তিযোদ্ধারা আগেরদিন বোমা মেরে ডেমরা-নরসিংদী হাইওয়েতে পাঁচদোনা ব্রীজ উড়িয়ে দেয়। এরপর হতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গাড়ী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাইওয়েতে কঠোর টহল চলছে অনবরত। আমাদেরকে হাইওয়ে পার হতে হবে। ঐ সময় হাইওয়ে পার হওয়া খুবই দুরূহ এবং জীবনের ঝুঁকি ছিল অনেক। বিকল্প পথ না থাকায় হাইওয়ে পার হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমরা ছিলাম সংখ্যায় প্রায় ২০/২২ জন। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হলো কিছুসময়। হঠাৎ সুযোগ পাওয়া মাত্র খুব দ্রুত হাইওয়ে পার হয়ে গেলাম। বিপদ এখানেই শেষ নয়। আগাম বন্যার পানিতে হাইওয়ের দক্ষিণ দিক পানিতে তলিয়ে যায়। প্রায় অর্ধ কোয়াটার মাইল নৌকায় যেতে হবে। কাছেই নৌকা

পেয়ে গেলাম। ৪ টি নৌকা ঠিক করে আমরা উঠে পরি নৌকায়। নৌকা চলছে ঠিকই কিন্তু হাইওয়েতে টহলরত হানাদার বাহিনীর নজরে পরলে রক্ষা নেই। ভয় হলো টহলের সময় নৌকাগুলো হোল্ড করলেই নির্ধাত মৃত্যু। কাজেই আমাদের উপর যাতে সন্দেহ না হয় সেজন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে কেহ নৌকার মাঝি, কেহ পানি সেচার কাজ করি, কেহ সাধারণ যাত্রী সেজে যেতে থাকি। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে পানিটুকু পার হয়ে পরে পায়ে হেটে সামনে যাওয়া শুরু করলাম।

এরপর নদী পার হয়ে বেশ পথ হেটে নবীনগর অতিক্রম করে শ্যামগ্রাম পৌছলাম। ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় অল্প কিছুসময় বিশ্রাম নিলাম সেখানে। এরপর অনেক পথ অতিক্রম করে মাঝখানে স্বল্প সময় রাতযাপন করতে হয়। তারপর আবার হাটতে হাটতে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পার্শ্বে ছতরা চানপুর নামক স্থানে স্থাপিত মসজিদ ও মাযারের নিকট পৌছলাম। শুনলাম আগরতলায় যাওয়ার জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এসে বিকালের দিকে এখানে জড়ো হয়। ঐদিন আমরাসহ সবাই মিলে ছিলাম প্রায় ২০০ জন। একজনকে গাইড ঠিক করা হলো। মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহতাআলার নিকট সকলেই দোয়া প্রার্থনা করলাম। হাইওয়ে পার হবো। হাইওয়ে পার হলেই পানি সাতার কেটে পার হতে হবে। সেজন্য সবাই লুঙ্গি বা গামছা পরে সাথে থাকা যার যার মালামালের ব্যাগ বা পোঁটলা হাতে নিয়ে আমরা তৈরি হলাম।

হাইওয়েতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিয়মিত টহল চলছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আগে থেকেই সেখানকার রাজাকারদের সহযোগিতা নিয়ে হাইওয়ে পার হওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যেমনঃ হানাদার বাহিনীর গাড়ী আসতে দেখা গেলে রাজাকারেরা একটি গুলি করবে এর মানে অশনিসংকেত। আর যদি কোন গাড়ী দেখা না যায় তখন একাধিক গুলি করবে এর মানে সবুজ সংকেত কোন গাড়ী নেই। সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই আমরা হাই ওয়ে পার হয়ে গেলাম। সামনে প্রায় ৩০০ হাত পানি সবাই এক হাতে পোঁটলা উঠিয়ে সাতার কেটে পানি পার হয়ে গেল। কিন্তু আমি মাঝামাঝি যাওয়ার পর পোঁটলা উপরে ধরে রাখতে না পেরে ডুবে যাচ্ছি দেখে আমাদের দলেরই একজন দ্রুত এসে আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে পাড় করে নিয়ে যায়। এ ধকলের পর শুরু হলো হাটা। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সামনে রেললাইন। দিনের বেলা হানাদার বাহিনী রেললাইনের উপর দিয়ে টহল দেয়, রাতে থাকে না। কাজেই তাড়াহুড়ো না

করে রেললাইন পার হয়ে প্রায় ১৫০ হাত পানি সাতার কেটে যেতে কোন অসুবিধা হয় নি। আরম্ভ হলো আরেক বিড়ম্বনা, থেমে থেমে হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে সবারই নাজেহাল অবস্থা। রাত প্রায় চারটার সময় পৌছলাম বাংলাদেশের শেষ সীমান্ত "মনিয়ন্দ" নামক স্থানে। এবার নৌকায় নদী পার হতে হবে। আমি কিছুটা দুর্বল হয়ে পরায় বেলেঙ্গ রাখতে না পেরে নদীর উঁচু পাড় হতে পা পিছলে গিয়ে একদম নিচে চলে গেলাম নৌকার কাছে। খুবই কষ্ট হচ্ছিল যা বলে বুঝানো যাবে না। তথাপিও মনোবল না হারিয়ে নৌকায় করে ভারতের সীমান্ত আগরতলার পথে 'মাধবপুর' নামক স্থানে গিয়ে পৌছলাম। গাইডের কথামত মাধবপুর থেকে বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় সবাই এক লাইন করে শৃংখলার সাথে হাটা শুরু করলাম। প্রায় ৩০/৩৫ মিনিট হাটার পর শোনা গেল বুট পায়ে হাটার আওয়াজ। মনে হলো যেন আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। কাছে আসার পর জানতে পারলাম ওরা ভারতীয় সৈন্য যাচ্ছে সীমান্ত টহলে। সৈন্য বাহিনীর কমান্ডার জিজ্ঞেস করলে আমাদের গাইড আমরা জয় বাংলার লোক বলে পরিচয় দেন। এরপর আমাদের সবাইকে প্রথম এবাউট টার্ন করায় পরে রাইট টার্ন করানোর পর আমাদের পিছন দিয়ে সৈন্য বাহিনী চলে গেল তাদের কাজে। অবশেষে আমরা হাটতে হাটতে ভোরে পৌঁছে গেলাম আগরতলায় অবস্থিত বিশাল কংগ্রেস ভবন। ঐসময় কংগ্রেস ভবন ছিল লোকে লোকারণ্য।

এরপর সবাই যার যার সুবিধামত আলাদা হয়ে গেল। আমি কংগ্রেস ভবনে কিছু সময় থেকে পরিচিতদের সাথে দেখা করলাম। পরে সেখান থেকে বের হয়ে পরলাম। কোথায় যাব ভাবতে লাগলাম। কিছু সময় হাটার পর দেখা হয়ে গেল আমাদের নেতা মাননীয় সংসদ সদস্য ময়েজউদ্দিন ভাইয়ের সাথে। তিনি আমাকে দেখে খুশী হলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন বাংলাদেশের সংসদ সদস্যগণ যে ভবনে থাকেন সেখানে। সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সাংসদ কয়েকজন ছিলেন আগে থেকেই সুপরিচিত। পরে অন্যান্যদের সাথেও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সাংসদগণ রুটিন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শনে যাওয়ার সময় তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ ছাত্রনেতা হিসাবে আমাকে সাথে নিয়ে যেতেন। অনেক জায়গায় গিয়েছি। এরমধ্যে হাপানিয়া ট্রাঙ্কিট ক্যাম্প গিয়েছি কয়েকবার (এখানে প্রশিক্ষণের জন্য লোকজনকে রিক্রুট করা হতো), গকুলনগর ক্যাম্প গিয়েছি দু'বার (এখানে কেবল হ্যান্ড গ্রেনেড এবং হালকা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো), দুর্গা চৌধুরী পাড়া প্রশিক্ষণ

ক্যাম্পে গিয়েছি (এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো)।

এছাড়া একাই গিয়েছি আগরতলায় বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী অফিসে। সেখানে আওয়ামীলীগ নেতা মাননীয় সংসদ সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব ও আরো লোকজনের সাথে দেখা হয়। কলেজ টিলায় মুজিব বাহিনীর একটি অফিসে গিয়েছি। সেখানে ছাত্রনেতা ডাকসুর সাবেক জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন ভাইয়ের সাথে দেখা হয়।

বাংলাদেশ হতে আগত কিছু সংখ্যক লোকজন আগরতলার এক এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে পরিবারসহ থাকতেন। সেখানে গিয়ে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেত্রী আমার ফোরকান ফুপুর সাথে দেখা হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। কয়েকজন ছাত্র নেতা কর্মীর সাথেও দেখা হয়। সেখান থেকে স্বেচ্ছায় অগ্রহী হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আশ্রয় শিবির বা শরণার্থী ক্যাম্পে ও অন্যান্য স্থানে থাকা লোকজনকে পরামর্শ দিয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতা করা হতো। তাদের সাথে থেকে আমারও সুযোগ হয়েছিল কয়েকদিন কাজ করার। ঐসময়ে কয়েকদিনের ব্যবধানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এবং মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়। তাঁকে দেখে মনে হলো '৭০ এর নির্বাচনে তাঁর সাথে ভোট চাওয়ার জন্য কতইনা ঘুরেছি পথে প্রান্তরে মাঠে-ময়দানে গিয়েছি মানুষের ঘরে-ঘরে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আবাবো তাঁর সাথে কিছু সময় হলেও থাকার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। তিনি পরিদর্শনে এসে আগরতলায় তার নির্ধারিত কর্মসূচি শেষে তথায় উপস্থিত বাংলাদেশি লোকজনের সাথে খোলামেলা মত বিনিময় করেন। তাদেরকে বিশেষ করে যুবকশ্রেণীকে বিলম্ব না করে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাগিদ দিয়ে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি যথারীতি আগরতলায় বাংলাদেশের এমপি হোস্টেলে চলে আসি। এবার প্রশিক্ষণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। এমন সময় ময়েজউদ্দিন ভাই এমপি হোস্টেলে এসে হাজির। তিনি এমপি সাহেবদের সাথে দেখা করে কথাবার্তা শেষে যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে ৩ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার গেলেন। ঐসময় সেক্টর কমান্ডার পরবর্তিতে মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ ও সেকেন্ড ইন কমান্ড পরবর্তিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এন এম নুরজ্জামান দুজনেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে ছাত্রনেতা হিসাবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। একজন ক্ষুদ্র ছাত্রনেতা বা

ছাত্রলীগের কর্মী হিসাবে তাদের সাথে আন্তরিকতার সহিত আনুষঙ্গিক কিছু কথা বলার সুযোগ পাওয়ায় সৌভাগ্যবান মনে করলাম। এরপর আমাকে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে থেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। সেসময় সেক্টর হেডকোয়ার্টারে বিশিষ্ট আরো ১৪/১৫ জন ছিলেন তাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের একটি গ্রুপ করা হলো। পরে যথানিয়মে হেজামারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমাদেরকে স্পেশাল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের সময় বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে ও গোলাবারুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং চালানোর ট্রেনিং দেওয়া হয়, পরীক্ষামূলক ফায়ারিং করানো হয়, খোলানো জোড়ানো, পরিষ্কার রাখার নিয়ম, ক্রলিং করা, শারীরিক কসরত, যুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়ম কানুনসহ প্রশিক্ষণ চলে প্রায় তিন সপ্তাহ। প্রশিক্ষণ বেশ কঠিন ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে সকলের প্রাকটিকাল টেস্ট নেওয়া হয়। এই টেস্টে তুলনামূলকভাবে সবার চেয়ে ভালো করতে পেরেছি জানানো হলে আমার মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম। আলহামদুলিল্লাহ। মনের ভিতর যথেষ্ট সাহসও অনুভূত হলো। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে হেডকোয়ার্টার ইনচার্জ সুবেদার মেজর শফিউল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে সেখানেই ছিলাম। মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ক্যাম্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার পর হেডকোয়ার্টারে এসে সাধারণত কয়েকদিন অবস্থান করতেন। হেডকোয়ার্টার ইনচার্জ সুবেদার মেজর শফিউল্লাহ সাহেব আমাকেও কয়েকদিন হেডকোয়ার্টারে থাকতে বললেন। তিনি এ সময়ে আমাকে অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব দিলেন, যেমন- সেখানে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ কোন প্রয়োজনে কেউ বাহিরে যাওয়া আসা করলে তাকে গোপনীয় পাসওয়ার্ড দেওয়া ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়াদি তদারকি করা। খুব উৎসাহের সাথে কাজগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে ক্যাম্পের সকলের সাথে আন্তরিকতা গড়ে উঠে। এবার প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে আসার পালা। সবাইকে বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করানো হয় এবং ঈমানি দায়িত্ব পালনের জন্য পবিত্র কোরআন পাক ছুঁয়ে শপথ পাঠ করানো হয়। এবার প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের সবার নিকট কারো হাতে, কারো কাঁধে, কারো মাথায়, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিল। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য দেশে ফিরে আসার পথ পুরাটাই ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। স্থলপথ ও পানিপথ সব জায়গায় হানাদার শত্রু বাহিনীর টহল খুবই শক্তিশালী ছিল। তারা যেমন ছিল দুর্ধর্ষ তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ক্ষিপ্ত। প্রশিক্ষণে

আসার সময় যদিও খালি হাতে এসেছিলাম। তথাপিও জীবন সর্বত্রই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। দেশে ফেরার পথে হানাদার শত্রু বাহিনীর আক্রমণে চলে গিয়েছে মুক্তিযোদ্ধার তাজা প্রাণ। তাছাড়া পথিমধ্যে কারো কারো কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ হাতিয়ে নিয়েছে শক্তিশালী দুষ্টকারীরা। যারা ফিরে এসেছেন তাদেরকে পাকিস্তানি দুর্ধর্ষ সশস্ত্র হানাদার শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপন লড়তে হয়েছে। তাদেরকে পরাজিত করার জন্য জীবনের মায়া তুচ্ছ করে জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে দীর্ঘ নয়টি মাস মরণপন যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেকে শাহাদৎ বরণ করেছেন, অনেকে আহত হয়েছেন অনেকে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন, কেউ কেউ স্বজনও হারিয়েছেন। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমি স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কে কোথায় কিভাবে আছে সে খবর পর্যন্ত নিতে পারে নি। তখন একটি চিন্তাই মাথায় ছিল হানাদার শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে না পারলে তারা আমাদের জীবিত রাখবে না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতের আগরতলা হতে নিজ এলাকায় দুপুরের পর পৌঁছালাম। তৎকালীন সময়ে কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে চারটি ইউনিয়ন। এর মধ্যে চরসিন্দুর ইউনিয়ন একটি। চরসিন্দুরের অদূরে টেক এলাকায় আসার পর দেখতে পেলাম পাকিস্তানি হানাদার শত্রু বাহিনীর ৬/৭ জন শত্রুসেনা (মনে হলো) পথ হারিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছে। ঐসময় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্যান্য লোকজন এ দৃশ্য দেখে ওদেরকে ধরার জন্য পেছনে ছুটছে। ঐ সময় আমিও তাদের সাথে থেকে অল্প কিছুদূর যাওয়ার পরই শত্রু সেনাদেরকে ধরে আটক করে ফেলা হয়। খবর পেয়ে এলাকার আরো উৎসুক লোকজনও ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে আটককৃতদেরকে লাথি কিল ঘুষি দিতে থাকে। এমতাবস্থায় সাথে সাথে সবাইকে নিয়ে আলোচনা করি। আটককৃতদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন। পরে উপযুক্ত সময়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯ নভেম্বর ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা বহুল দিনগুলির মধ্যে একটি স্মরণীয় দিন। এদিনের ঘটনার স্মৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। সারা দেশব্যাপি চলছে পাকিস্তানি হানাদার শত্রু বাহিনীর হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, লুটতরাজ আর মা-বোনদের উপর হীনতম অমানুষিক জঘন্য অপরাধের মত নির্যাতন। শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত কাপাশিয়া থানা। এই থানা কার্যালয়ে

পাকিস্তানি হানাদার শত্রু বাহিনীর ক্যাম্প। সেদিন নদীর পূর্ব পাড়ে তরগাও বাজারে সাপ্তাহিত হাট। লোকজন মালামাল ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সকাল থেকেই হাটে আসতে শুরু করে। দুপুরের দিকে ১২/১৪ জন শত্রু সেনা নৌকায় চড়ে নদী পাড় হয়ে তরগাও হাটে ঢুকে পড়ে। হাট হতে লোকজনের খাসি, ছাগল, হাঁস-মুরগী অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়া ছিল ওদের উদ্দেশ্য। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা সৈন্যদের দেখে অনেক মানুষ ভয়ে পালাতে থাকে। এ খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ সিরাজ সাহেবের নেতৃত্বে ঐ এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধারা নদীর পাড়ে তরগাও ঘাটে এসে একত্রিত হয়। আমি খবরটি পেয়ে সাথে সাথে তরগাও যাওয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকি। পথিমধ্যে এক যানবাহন পেয়ে যাওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। ঐস্থানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা সকলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কালবিলম্ব না করে সাথে সাথেই সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যখন শত্রু সেনারা তাদের ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য মালামাল নিয়ে নৌকায় উঠে নদীর মাঝামাঝি যাবে তখনই তাদের উপর গুলি শুরু করা হবে। যাতে গুলি খেয়ে সবগুলো নদীতে পড়ে মারা যায়। এর আগে আমরা নিরাপদ স্থানে ওৎ পেতে থাকলাম যাতে ওরা বুঝতে না পারে। যেমন কথা তেমন কাজ। বেলা ডুবে ডুবে ভাব এমন সময় শত্রু সেনারা লুট করা খাসি ছাগল মুরগী ও অন্যান্য মালামাল নৌকায় উঠিয়ে নদীর মাঝামাঝি যাওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর গুলি ছোড়া শুরু করা হয়। আমাদের গুলির আওয়াজ শোনার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপাশিয়া থানা ক্যাম্প হতে পাকিস্তানি শত্রু সেনারা আমাদের দিকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুহূর্তে হঠাৎ আমার ডান দিকে থাকা একজনের গায়ে গুলি লাগলো। গুলি খেয়ে লোকটি মাটিতে পড়ে গিয়ে কাতরাতে থাকে। সাথে সাথে স্থানীয় কয়েকজন মিলে গুলিতে আহত লোকটিকে স্থানীয় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের দিক হতে গুলি করা বন্ধ করা হয়। অপর দিক হতেও আর কোন গুলি করা হয় নি। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে আমরা কিছুক্ষণ সে স্থান থেকে কথাবার্তা বলি। এরপর সবাই যার যার বাড়ীতে চলে যায়। কেউ কেউ আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেও আমার এক আত্মীয় জোর করে উত্তর খামাইর তাদের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যায়। সেখানে রাত যাপন করি। পরদিন ২০ নভেম্বর ১৯৭১ পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন। সকালে কিছু সেমাই পিঠা খেয়ে আত্মীয়ের সাথে কাছেই ঈদগাহ মাঠে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করি। ঈদের নামাজ শেষে লোকজন

গতকালের অপারেশন সফল হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। সেখান থেকে চলে আসার সময় অনেক পরিচিতজনের সাথে রাস্তায় দেখা হয়। তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে কিছুক্ষণ নদীর পূর্ব পাড় দিয়ে হেটে চলার পর নদীর স্রোতে শত্রুসেনাদের মৃত দেহ, খাসি, ছাগল, পানির উপর ভেসে ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়ে যেতে দেখলাম। এতে অনুভূত হলো শত্রু সেনা কেউই বেচে নেই। আমাদের মধ্যে একজন গুলিতে আহত হয়েছেন তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি। আর অন্যরা সবাই নিরাপদ অবস্থায় থেকে অপারেশন খুবই সফল হওয়ায় আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আরেকটি খুবই স্বর্ণীয় ঘটনা যার সংক্ষিপ্ত স্মৃতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাস। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি কালীগঞ্জ থানা এলাকা বলতে গেলে পাকিস্তানি হানাদার শত্রু মুক্ত। আনুমানিক ডিসেম্বর মাসের ১২/১৩ তারিখ প্রায় এগারোটার সময় জামালপুর এলাকায় অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ করে বোমার বিকট শব্দ শুনতে পাই। মনে হলো ঘোড়াশাল ব্রীজের দিকে। কিছুক্ষণ আবার বোমার শব্দ। এবার বুঝতে পেরে ঘটনাটি জানার জন্য ব্রীজের দিকে হাটে লাগলাম। পথিমধ্যে একজন লোকের গায়ে বোমার শেল এসে লাগায় লোকটি রাস্তায় পরে কাতরাচ্ছিল। স্থানীয় লোকজনকে বলে তাড়াতাড়ি আহত লোকটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ব্রীজের গাঁড়ায় উত্তর দিকে পৌঁছার পর দেখলাম শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়ে সম্ভবত মুলগাও এলাকায় উড়োজাহাজ হতে বোমা ফেলা হচ্ছে। যে জায়গায় বোমা ফেলা হচ্ছে ঐ জায়গায় পুকুরের মত বিশাল গর্ত হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ভারতীয় যৌথ বাহিনী আগের দিন ঘোড়াশাল ফ্লাগ রেল স্টেশনে ক্যাম্প করে অবস্থান করছেন। ভাবলাম তাঁরা হয়তো মনে করলো নদীর পশ্চিম দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা অবস্থান করেছে এই ভেবে বোম্বিং করা হচ্ছে। দ্রুত স্থির করলাম কালীগঞ্জ থানা এলাকা তখন পাকিস্তানি হানাদার শত্রু মুক্ত এই খবরটি যৌথ বাহিনীর নিকট পৌঁছানো খুবই জরুরী অন্যথায় এভাবে বোম্বিং করতে থাকলে আরো বিশাল ক্ষতির সমুহ সম্ভাবনা। কিভাবে খবর পৌঁছাব অস্থির হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আর কোন উপায় না দেখে আল্লাহর উপর ভরসা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্রীজের উপর দিয়ে দ্রুত হেটে ব্রীজ পাড় হতে লাগলাম। যদিও ভয় ছিল ব্রীজের উপর বোমা ফেলা হয় তাহলে আর রক্ষা নেই নির্ধাত মৃত্যু। বাঁচানোর একমাত্র মালিক মহান আল্লাহতায়াল। ব্রীজ পাড় হয়ে গেলাম। সাথে

সাথে যৌথবাহিনীর কর্মকর্তাকে আমার পরিচয় দিয়ে পশ্চিম পাড়ে পাকিস্তানি সৈন্য নেই খবরটি পৌঁছানোর পরপরই বোম্বিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও জানমাল ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করতে আল্লাহর রহমতে সক্ষম হই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর

মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে জনগণের মধ্যে শান্তি ও সুরক্ষায় কাজ করতে এগিয়ে আসেন। তখন আমি ও কমান্ডার বদিউজ্জামান খসরু সাহেব মিলে পরামর্শ করলাম আমাদের একটি অফিস খুবই প্রয়োজন। খুঁজে দেখলাম হাজী ডিপটি গাজী সাহেবের (তৎকালীন আওয়ামীলীগের নেতা গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেবের ছোট ভাই) একটি বিল্ডিং কালীগঞ্জ থানা ও বাজারের উত্তর দিকে খালি আছে। বিল্ডিং এর দোতালায় অফিস নিতে পারলে ভালো হয়। ভাবলাম হাজী সাহেবের সাথে কথা বলবো। তিনি আমার আত্মীয় ও তাঁর সাথে সুসম্পর্কও ছিল। হাজী সাহেবের সাথে দেখা করলাম। ওনার বিল্ডিং এর দোতারা সাময়িকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়ার জন্য আবদার করলাম। সাথে সাথে তিনি দিতে রাজি হলেন এবং এও বললেন ভাড়া দিতে হবে না। খুব খুশী হলাম। অফিস চালু করার পর কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা অনেকে সেখানে নিয়মিত আসতেন। এক পর্যায়ে অনেকে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে এখানে চলে এসে থাকা শুরু করেন। সবার জন্যই নিয়মিত থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বিজয় লাভের পর তখন কালীগঞ্জ থানায় পুলিশ সরকারী কর্মকর্তা কেউই ছিলেন না। তৎকালীন কালীগঞ্জ থানায় শীতলক্ষ্যা নদীর উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকে মোট এগারোটি ইউনিয়ন ছিল। মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কমান্ডার সেকশন কমান্ডারগণকে নিয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে নোটিশ দিয়ে সভা করেছি। নিম্নে বর্ণিত গ্রুপ কমান্ডার, সেকশন কমান্ডার যেমনঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা বদিউজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাতেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রহিসুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোতা মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা লাল মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আরমান মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আউয়াল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজহারুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর খন্দকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক এদের মধ্যে অনেকে ছাড়াও অগ্রহী কিছু বীর মুক্তিযোদ্ধাগণও

সভায় উপস্থিত থাকতেন। পরবর্তিতে থানা অফিসারগণ কর্মস্থলে আসার পর তারাও কোন কোন সভায় উপস্থিত থাকতেন।

সভায় কিভাবে নিজেদের উদ্যোগে কালীগঞ্জ থানা এলাকায় জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া ও শান্তি বজায় রাখা যায় সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সকল এলাকায় খোঁজ খবর নেওয়া অব্যাহত থাকে। কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে বা কোন অভিযোগ আসলে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে খুবই সন্তোষজনকভাবে সমস্যা নিষ্পত্তি করতে সফল হয়েছি। কেউ কোন সহযোগিতার জন্য আসলে ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অনেককে সুপরিশ পত্র দিয়েছি। এতে অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। আমাদের কর্মতৎপরতায় এলাকার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাতৃভূমির জন্য আমরা সততার সাথে কাজ করতে গিয়ে জনগণের যথেষ্ট আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। কালীগঞ্জের জনগণের নিকট হতে যে অকৃত্রিম গভীর ভালোবাসা পেয়েছি তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ থাকবে সবসময়। দিন চলে গেছে অনেক, সেদিন আর আসবে না। বাংলাদেশের বিজয় লাভের কিছুদিন পর সেপ্টেম্বর-৩ হেড কোয়ার্টার হতে সেপ্টেম্বর কমান্ডার স্বাক্ষরিত হাতের লেখা একটি চিরকুট/স্লিপ পেলাম।

উহাতে সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র সাথে নিয়ে সাভার আনসার ট্রেনিং ক্যাম্পে রিপোর্ট করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। সাথে সাথে এ আদেশ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধা যারা অফিসে থাকতেন তাদেরকে নিয়ে সেপ্টেম্বর কমান্ডার আদেশ মোতাবেক সাভার গিয়ে প্রত্যেকে অস্ত্র জমা দিয়েছি। অনেকে আলাদাভাবে সাভার গিয়ে অস্ত্র জমা দিয়েছেন।



বীর মুক্তিযোদ্ধা মোড়ল বজলুল করিম

আড়পাড়া, বারুইপাড়া, বাগেরহাট

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার পর মনে মনে নিয়েছিলাম যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপর আরো বিশ্বাস হয়ে গেল ২৫শে মার্চ কাল রাত্রি। ২৫ মার্চ কাল রাত্রে অসহায় বাঙ্গালির উপর বিরতিহীন পাক সেনাদের গুলিবর্ষণ, তান্ডবলীলা, জ্বালাও পোড়াও লুটপাট হত্যা, তাই আমরা আর ঘরে থাকতে পারলাম না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমরা অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরহুম সুলায়মান মোড়ল, শেখ রুহুল আমিন, বারানীয়া (ফকিরহাট) গ্রামের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিঃ নায়ক আঃ কাদের, আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই নূরুজ্জামান (তখন তার বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর, সে ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট), ফকির আজমল, মোঃ আজিজুল হক, আহম্মদ শেখ, নূর ইসলাম শেখ, আফজাল মোড়ল এবং পারকুরশাইল গ্রামের শেখ ইশারত আলী, শেখ নজরুল ইসলাম, শহিদ শেখ হোসেন আলী, শহিদ মোড়ল, অহীদ শেখ, ইশারত শেখ মোট ১৬ জন আমাদের গ্রাম হতে কেউ কেউ দুপুরের খাবার খেয়ে না খেয়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গ্রামের উত্তর দিকে বিলের ভিতর দিয়ে মরহুম আঃ আজিজ মোড়লের খোলা বাচাডী নৌকায় করে হানাদার মুক্ত এলাকা দিগংগা বারুইগাতী হয়ে সারুলিয়া রাজপাট আমাদের এক আত্মীয় মোঃ হাসেম মিয়াব বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি। ভোর রাতে পায়ে হেটে চুনখোলা গিয়ে নৌকা যোগে যশোর জেলার আড়পাড়া বরইচারা হয়ে কালিবাঁব রোড (সিএন্ডবি) পার হয়ে দিনের বেলায় একটা আখ খেতে দিন যাপন করি। রাতে বাগদা বর্ডারের কাছেই রাত্রি যাপন করি। মাদারতলা নামক একটা বাজার পাই কিন্তু কোন বসতি দোকান ছিল না। পরের দিন সকালে বাগদা বর্ডার পার হয়ে বাস যোগে বশিরহাট ক্যাম্প এ নাম লিখিয়ে ভ্যাবলা ক্যাম্পে অবস্থান করি। স্বশস্ত্র ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের মধ্য হতে ৩ জন ১) মরহুম সুলাইমান মোড়ল, ২) আফজাল

মোড়ল ৩) শহিদ মোড়ল বিহার বীরভূম ট্রেনিং সেন্টারে যায়। পরে ওরা অন্য দলের সাথে ট্রেনিং শেষ করে বাগেরহাটের কান্দাপাড়ার আমজাদ মিঞার সাথে আসে। আমরা বাকি সবাই ট্রেট্রা ক্যাম্পে অবস্থান করি। ৭/৮ দিন থাকার পর বিহার চাকুলিয়া স্বশস্ত্র ট্রেনিং এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। একই সঙ্গে আমাদের ইউনিয়নের বাকপুরা গ্রামের শেখ লিয়াকত আলী, শেখ বেয়াজ উদ্দিন, মোঃ আতিয়ার জোমাদ্দার, মোশাররাফ জোমাদ্দার, নওয়াব আলী খা সহ আরো অন্যান্য ইউনিয়নের বীর মুক্তি সেনারা আমাদের সাথে ছিল। পূর্বেই আমাদের গ্রামের আহম্মদ শেখ এবং নূর ইসলাম শেখ কিছু জিনিসপত্র কেনার উদ্দেশ্যে ক্যাম্পের বাইরে আসে এবং পরবর্তীতে আর ক্যাম্পে ফিরে যায় নি। পরে বাকী সবাই স্বশস্ত্র ট্রেনিং নেয়ার জন্য ট্রেন যোগে চাকুলিয়ায় পৌঁছাই। এক মাস ট্রেনিং এর মধ্যে প্রতিটা ইভেন্টে আমি প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাশ করি ও প্রথম স্থান অধিকার করি। রাইফেল সুটিং এ ১১টা উইংস ছিল এবং সেই উইংস গুলোতে সব প্রতিযোগী ট্রেনারদের মধ্যে আমি প্রথম স্থান লাভ করি। ২য় হয় বাকপুরা গ্রামের শেখ লিয়াকত আলী। ট্রেনিং শেষ করে বেগুনদিয়া ক্যাম্পে আসি। ওখানে মেজর এম এ জলিল (৯নং সেক্টর কমান্ডার) এর কাছে রিপোর্ট করার পর দুই-তিন দিন সেখানে থাকি। পরে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরের অধিনে সর্ব বৃহৎ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শতাধিক মুক্তিসেনা বাগেরহাট শহরের উত্তর অঞ্চলে প্রধান ঘাটি করার উদ্দেশ্যে বড় ২টি বাস যোগে বাগদা বর্ডার পার হওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথের মধ্যে আমাদের একটি বাস দুর্ঘটনায় সেটির মধ্যে আমি নিজে ও আমার ছোট ভাই সহ আরো অনেকেই ছিলাম। সেখানে আমরা অনেকেই আহত হই। বাসটি বিকল হয়ে গেলে পাশে থাকা ইন্ডিয়ান আর্মিদের ঘাটিতে সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গাড়ী নিয়ে এসে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমাদের অন্য গাড়ীটি সহ বাগদা বর্ডার পার করে দেয়। আমাদের দলের ভিতর থেকে ৩ জন খুব গুরুতর আহত হওয়ার কারণে ঐ আর্মি ক্যাম্প হাসপাতালে চিকিৎসা অবস্থায় থেকে যায় এবং তাদের অস্ত্র আমরা নিয়ে আসি। আমরা বর্ডার পার হয়ে নিরাপদ এলাকা দিয়ে খুব সতর্কতার সাথে সোর্সের মাধ্যমে দিনে সুন্দরবন এবং রাতে খুলনা জেলার তেরখাদা থানা এলাকা হয়ে শান্তপু হাইস্কুলে এসে ঘাটি করি যা বাগেরহাট থানার অন্তর্গত এবং সেখানে থেকে বিভিন্ন এলাকার পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করি। প্রতিটা যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। নাজিরপুর থানার রঘুনাথপুর ক্যাম্পে আক্রমণ করা কালীন সময়ে আমাদের সঙ্গী শেখ হোসেন আলী সহ

২ জন শহিদ হন। গোটাপাড়া, পানিঘাট, চিরুলিয়া বিষ্ণুপুর, বাবুরহাট, বয়াসিংগা নামক এলাকায় পাক বাহিনীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তাছাড়া চিত্রা নদীর এপার ওপার পাকবাহিনী এবং রাজাকারদের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ লেগেই ছিল। এর ভিতর আমার স্মরণীয় গোটাপাড়া ও বাবুরহাট যুদ্ধে হানাদার বাহিনীদের পরাস্ত করে ওদের অনেকের লাশ নদী হতে উদ্ধার করি ও সাথে যুদ্ধকালীন সময়ের অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করি। আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে নিজ এলাকায় না থাকার কারণে ঐ সময়ে রাজাকার ও হানাদার বাহিনীরা আমাদের পরিবারের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার রজব আলীর লালনকৃত রাজাকাররা আমাদের বাড়ীঘর লুট-পাট ও জ্বালাও পোড়াও করেছে। এভাবে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে ৭/৮ মাসব্যাপী যুদ্ধ হওয়ার পর এক পর্যায়ে বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে হানাদার বাহিনীরা পর্যাক্রমে পরাজিত হতে থাকে এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলে আমরা বাগেরহাট শহর মুক্তকরণ অভিযান অব্যাহত রাখি এবং রাজাকার বাহিনীর প্রধান ফকির রজ্জব আলী তার দলবলসহ পালিয়ে যায় এবং ১৭ই ডিসেম্বর আমরা বাগেরহাট শহর দখল করি এবং বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। আমরা বাগেরহাটে ক্যাপ্টেন তাইজুল ইসলাম এর নিকট আমাদের সকল অস্ত্র জমা দিয়ে ম্যালেশিয়া ক্যাম্পে থাকি (নূরুল আমিন হাইস্কুলে) উল্লেখ্য মিলেশিয়া ক্যাম্পে থাকাকালীন আমি বি.এইস.এম পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করি। পরে ক্যাম্প বিলুপ্ত হবার পর লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়িতে চলে আসি।



ফর্ম-১ ফর্ম-২ ফর্ম-৩ ফর্ম-৪ ফর্ম-৫ ফর্ম-৬